ALOKAVISAR

By Ajit Ganguli

Rs. 2·00 only.

আলোকাভিসার

অজিত গাঙ্গুলী
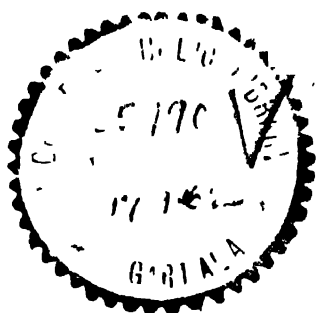
ক্লাসিক প্রেস
৩।১-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোকাভিসার

ধূ-ধূ করা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দেখা যায় ধান ক্ষেতগুলো সরাসরি বিদীর্ণ হয়ে আছে।

মাইলের পর মাইল এই রুক্ষতার আশে পাশে দূর দূর কোন একটি চতুষ্কোণ পরিধিতে রবিশস্যের শ্যাম সমারোহ, আর সেই দিগন্তবিস্তারী ধান-ক্ষেত গিয়ে মিশেছে কেদোর নিম্ন জলাভূমিতে। জলা নামে—এখন জল নেই। ফেটে হাঁ হয়ে উর্দ্ধমুখীতে তার হাজার মুখগহ্বর দিয়ে একফোঁটা জলের জন্য স্তিমিত হয়ে আছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের অস্তোন্মুখ সূর্যের আশে পাশে বিদ্রূপ করা দুটো একটা ভাসা মেঘে তখন রংয়ের খেলা চলেছে। মাটি আর আকাশের ছোঁয়াছুঁয়ির সন্ধিস্থানে সহসা ফুটে উঠল একসারি চলমান কালো বিন্দু। এগিয়ে আসে ঐ কালো বিন্দুর সারি, কাছে আসতে দেখা যায় একটা ছাউনি দেওয়া গরুর গাড়ী আর তার পেছনে আর একটা চাল খোলা গরুর গাড়ী। আর ঐ গরুর গাড়ী দুটির পেছনে পেছনে আসছে ছেলে-বুড়ো, যুবক—নানান্ বয়সের নানান্ চেহারার একদল মানুষের গোষ্ঠী। এরা একটি যাত্রাদল। চলেছে যাত্রা গেয়ে মানুষের মনোরঞ্জনের খোরাক জোগাতে।

গাড়ী দুটি আর পায়ে হাঁটা মানুষগুলি খুব কাছে এসে পড়ে। দেখা যায় তাদের স্পষ্টভাবে। ছাউনি দেওয়া গাড়ীটায় বসে দলের অধিকারী—মাঝবয়সী, মাথায় টাক, গলাবন্ধ কোট আর আধময়লা ধুতি পরা গদাধর দত্ত বিড়ি টানছে আর তার পাশে বসে আছে কুমরুল গাঁয়ের বারোয়ারীর ম্যানেজার কেষ্ট সামন্ত। পায়ে হেঁটে চলেছে দলের অন্যান্য শিল্পীরা। সঙ্গে আছে দলের অধিনায়ক নন্দ মাস্টার।

চারদিক দেখতে দেখতে চলেছে তারা পল্লীর আঁকা-বাঁকা কাঁচা রাস্তায়। হাঁটুভর্ত্তি ধুলোর মধ্যে তাদের পায়ের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চাল খোলা গাড়ীটায় রয়েছে বড় বড় কালো রংয়ের তিন-চারটি ট্রাঙ্ক। তাদের মলিন গাত্রাবরণে লেখা 'বিমলা অপেরা'।

আর আছে গদা, তীর ধনুক, বর্শা, তরোয়ালের বাণ্ডিল, লাঠি ও পাঁচ-দশটি টুকিটাকি যাত্রাপার্টির সাজ-সরঞ্জাম।

এই দুই গাড়ীর পেছনে পেছনে আসছে যাত্রাদলের ওরা—যারা বছরের পাঁচমাস ঘর ছাড়া। পাঁচমাস যারা বাংলার পল্লীর বাঁশ ঝাড়ের পাশে, ভাঙা-দেউলের আঙ্গিনায় চাষী-মজুরদের গতরে তোলা বারোয়ারীর প্রাঙ্গণে হেসেছে, কেঁদেছে, গেয়েছে কত গান। পাঁচমাস ধরে যারা শুধু খেয়েছে মোটা চালের ভাত, জলো বিউলির ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট।

যারা ভুলে গেছে ঘরের কথা, যারা ভুলে গেছে নিজের সত্বাও—যারা শুধু রাজা-রাণী-মন্ত্রী-সেনাপতি, বিদূষক আর বিবেকের পোশাকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে হাজার হাজার বাংলার অশিক্ষিত নর-নারীকে।

যারা শুনিয়েছে পতিগতপ্রাণা সতী-সাধ্বীর কথা, যারা-শিখিয়েছে ভ্রাতৃত্বের মধুর সম্বন্ধ, মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসার মহামন্ত্র যারা গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে বেড়িয়েছে—এরা সেই সব চারণের দল। ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত সৈনিকের দল।

চলতে চলতে নন্দ মাস্টার মিষ্টি দরদ ভরা কণ্ঠে সবাইকে তাড়া দিল—একটু পা চালিয়ে আয় বাবারা। যেতে হবে অনেক দূর।

সামনের দিকে তাকায় নন্দ মাস্টার। তার চোখদুটি জলে টলটল করে ওঠে। মনে পড়ে, যে দলের অধিনায়ক সে, সে দলটির খ্যাতি আছে কিন্তু সম্ভ্রম নেই। মালা আছে কিন্তু পেটে ভাত নেই। আসরে তারা মহামান্য কিন্তু আসর ছাড়া জীবনে তারা অপাংক্তেয়। ঘৃণা আর অবজ্ঞার পাত্র।

তবু এ জীবন পাল্টাতে পারে না নন্দ মাস্টার। এই ঘৃণা আর অবজ্ঞার মধ্যেই সে তার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। চেষ্টা করে চলেছে এই অবহেলিত যাত্রাপার্টিকে বরেণ্য করে তোলার। এদের সে বসাতে চায় সম্মানের আসনে, এদের সে পাওয়াতে চায় প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা। এই তার জীবনের একমাত্র কামনার বস্তু। সেই আশায় বুক বেঁধে নন্দ মাস্টার বছরের পর বছর প্রতীক্ষা করে চলেছে, করে চলেছে কঠোর পরিশ্রম।

মনে পড়ে তার, কত জায়গায় গিয়েছে—কত মানুষ কত দেশের আঙিনায় তারা গেয়েছে জীবনের গান, ভালোবাসার গান। কিন্তু সত্য, ন্যায় আর ধর্মের প্রয়োজন, সবই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। বুঝেছে সে যে আসর ছাড়া তাদের কোন মূল্য নেই—নেই কোন মর্যাদা। তবু, তবু চেষ্টা করে চলেছে

নন্দ মাস্টার। যেমন করেই হোক্ 'যাত্রাদলের ছোকরা' এই অপবাদ, এই ঘৃণা আর অখ্যাতি থেকে সে নিজেকে আর ওদের মুক্ত করবেই।

মহাকালের চাকা ঘোরে। নন্দ মাস্টার যৌবনের সীমানা পেরিয়ে বার্দ্ধক্যের সীমারেখার মধ্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখনও সে পারেনি তার স্বপ্ন সফল করতে। এখনও তাকে শুনতে হয়,—'যাত্রাদলের ছোকরা'! মনে আঘাত পেলেও হাল ছাড়েনি নন্দ মাস্টার, তাই এখনও চেষ্টা করে চলেছে তার বাসনা সফল করার আশায়।

পথ চলতে চলতে অনেকবার বলেছে, আবার বলল বারোয়ারীর ম্যানেজার কেষ্ট সামন্ত—ছি ছি, আপনি করছেন কি মশায়? এত বড় লজ্জা নিয়ে আপনার মুখের দিকে চাইতে পারছিনা যে! ও নন্দবাবু, আরে উঠে আসুন! গ্রাম যে এসে পড়ল!

নন্দ মাস্টার উত্তর দেয় না,—শুধু হাসে। অধিকারী বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—কি যে হাস তুমি, গা জ্বলে যায়! দলের হেরো হয়ে কিনা ধূলো ঘেঁটে গাঁয়ে গিয়ে ঢুকবে? বলি এতে দলের এজ্জোত বাড়বে, না কমবে?

নন্দ বলে—বাড়বে অধিকারী, বাড়বে।

অধিকারী রেগে বলে—বাড়বে মানে? লোকে যখন দেখবে বিমলা-অপেরার নন্দদুলাল যতসব ফোকরে পিলিয়ারদের সঙ্গে ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করতে করতে পায়দলে গাঁয়ে এসে ঢুকছে, তখন তোমার সঙ্গে যে বিমলা-অপেরাও কাৎ হবে, বুঝতে পারছনা?

হেসে নন্দ মাস্টার বলে—তুমি তো জান অধিকারী, ওরাও যা আমিও তাই। আমার কাছে হীরো আর কাটা সৈনিকে কোন তফাৎ নেই। আমিও শিল্পী ওরাও শিল্পী। আমি গাড়ী চড়ব আর ওরা হেঁটে আসবে এ কোনদিন হতে দিইনি, আর এখানেও হতে দোব না।

কেষ্ট সামন্ত চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল—সিকি মশায়,—আপনাতে আর ঐ ফোক্‌রেগুলোতে কি এক? রামে আর রামছাগলে?

অধিকারী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—বলুন দিকি! দলের একটা পিরিসটিজ নেই? দলের হেরো হয়ে সব জায়গায় এমনি ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে গেলে কখন চলে?

নন্দ বিরক্ত হল, বললে—অধিকারী, ওদের অপমান আমি সহ্য করব না। মনে রেখ, সাংসারিক মানুষদের মধ্যে উঁচু-নীচু নিয়ে গোল

বাধলেও শিল্পীদের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদ আমি সহ্য করতে পারি না। আমি বুঝি শিল্পীর কোন জাত নেই! আর তুমি প্রেষ্টিজের কথা বলছ, অধিকারী? ও রকম প্রেষ্টিজ নিয়ে দাঙ্গা করা যায়, সৃষ্টি করা যায় না।

নন্দ মাস্টার উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। একটু থেমে দম নিয়ে আবার বললে,—আর কতদূর ম্যানেজার বাবু, গাঁয়ের যে কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না?

তাড়াতাড়ি কেস্ট সামন্ত বললে—এই য এসে পড়েছি। ঐ তো, ঐ দেখা যাচ্ছে আমাদের গাঁ। ঐ বাঁশঝাড়টার পেছনেই হল আমাদের বারোয়ারীতলা। এসে পর্ডেছি বলে।

নন্দ মাস্টার তাকায় সামনের দিকে। দেখা যায় দূরে বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে খোড়ো চালের ছাডা ছাড়া কয়েকটা মাথা। দল এগিয়ে চলে।

আরো কিছুটা এগোতেই ছুটে আসে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, আনন্দে হৈ-চৈ করতে করতে। একটা আলের ওপর তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পরম বিস্ময়ে। শুধু একটি বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলে ছুটে আসে দলের দিকে।

থমকে দাঁড়ায় নন্দ। দাঁড়িয়ে পড়ে গোটা দলটাই। ছেলেটি কাছে এসে হাঁফাতে থাকে। তার বিস্ময় ভরা ডাগর চোখ দুটি ঘুরে বেড়ায় সমগ্র দলটার ওপর। নন্দর চোখে একটা পরম আনন্দ থমথমিয়ে ওঠে। মুখে ফুটে ওঠে একটা বিস্ময়কর হাসির রেখা। সে অপলকে চেয়ে থাকে তার দিকে।

অধিকারী বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—আরে তোমার আবার কি হল? থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লে যে? কি দেখছ অমন করে?

নন্দ মাস্টার কম্পিত কণ্ঠে বলে—দেখছি এই ছেলেটাকে। জান অধিকারী, এই ছেলেটার মুখে আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি! হাঁ আমার চোখ দিয়ে ও আমাকে দেখছে। তারপর আবেগভরা কণ্ঠে ছেলেটিকে প্রশ্ন করে,—হাঁ বাবা,—তোর বাড়ী কোথায়?

ছেলেটি পেছন দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ঐ গাঁয়ে। আপনারাই তো যাত্রা করবেন আজ বারোয়ারীতলায়?

নন্দ মাস্টার বলে—হ্যাঁ।

অধিকারী এবার ধমকে ওঠে—তোমার কি কাণ্ড-জ্ঞান রহিত হয়ে গেছে নন্দ? সন্ধ্যে হয়ে এল—এখনও পৌঁছতে পারলুম না, আর তুমি এখানে গল্প জুড়ে দিলে!

কেষ্ট সামন্ত ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—ঠিক কথা। আর দেরী করা চলে না মশাই! তাড়াতাড়ি চলুন। দশটায় গান না জুড়তে পারলে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। চলুন-চলুন—এই ছোঁড়া—যা ভাগ্ এখন! তারপর নন্দ মাস্টারকে বলে—ও নন্দবাবু,—এবার চলুন মশায়!

নন্দমাস্টার বলে—হাঁ চলুন! বলে, ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে বলে—চল্ বাবা, যেতে যেতে তোর সঙ্গে কথা কইব। আয়—।

দুই

যাত্রার আসর বসেছে কুমরুল গাঁয়ের বারোয়ারীতলায়। হ্যাজাকের আলোয় পাড়াগাঁয়ের ঘন অন্ধকারকে ফিকে করে দিয়ে একটা নরম ঝিম্‌ঝিমে অস্পষ্ট জ্যোতি-পেলবতায় চারদিক যেন মায়াময় হয়ে উঠেছে। দর্শকদের কোলাহল আর দূর দূর গ্রাম থেকে আসা অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষেতের বুকে গ্রামবাসীদের জলন্ত লণ্ঠনগুলো আলোর বিন্দুর মত ঝিক্‌মিক্ করে। দেখে মনে হয় যেন ঐ দূর ক্ষেতের নিবিড় আঁধারের মধ্য থেকে এক ঝাঁক জোনাকী এগিয়ে আসছে।

এদিকে গ্রীনরুমের চটে ঘেড়া দেওয়ালের ধারে দেখা যায় সেই ফুটফুটে ছেলেটিকে। চটের ফাঁক দিয়ে সে চুপি চুপি দেখছিল তন্ময় হয়ে, তার স্বপ্নে দেখা রাজা-রাণী, রাজকুমার-রাজকুমারী আর সেনাপতিদের। কি চমৎকার দেখতে! ঝক্‌মকে পোশাক, গলায় মোতির মালা! তরোয়াল নিয়ে কেউ কোমরে বাঁধছে, কেউ মাথার চুল ঠিক করছে। সে অভিভূতের মত দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা দৃশ্যে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সে দেখল, সুন্দরী রাজকুমারী পাশের একটা সৈনিকের গলা জড়িয়ে ধরে বিড়ী খাচ্ছে। গল্ গল্ করে তার নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মুহূর্তে তার রঙিন স্বপ্নটা খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে গেল।

এমন সময় পিছন থেকে এসে তার গায়ে হাত রাখল নন্দ মাস্টার। চমকে উঠল ছেলেটি। যেন মহা অপরাধ করেছে ভেবে ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

নন্দ মাস্টার হেসে তার ভয় ভাঙিয়ে দিয়ে তাকে সঙ্গে করে গ্রীনরুমের ভেতরে এনে দাঁড় করালে। ছেলেটি দেখল, তারই বয়সী সব ফুট্‌ফুটে সখীরা ঝল্‌মলে পোশাক পরে ঝিক্‌মিকিয়ে বেড়াচ্ছে।

নন্দ মাস্টার তাঁকে চা খেতে দিল। একটা বিস্কুটও দিল। ছেলেটি চা বিস্কুট খায় আর তার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে নন্দ মাস্টার। যেন তার মন বলে—পেয়েছি!—এতদিন পরে পেয়েছি আমার উত্তর সাধককে।

দলের মোশান্ মাস্টার, যাত্রা জগতের দিক্‌পাল, রোগা, ক্ষুদে মানুষটির দুচোখে স্বপ্ন-সফলতার ছাপ ফুটে ওঠে। নন্দ মাস্টার, যে দলের উপযোগী নাটক লেখে আর পয়সা না পেলেও দল ছেড়ে যায় না ; তার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে সে ভালোবাসে এই ছেলেটিকে। ভালোবেসে শুধু হা-হুতাশ করে আর চেঁচায়—নাঃ! যতদিন না লেখাপড়া জানা ছেলে-ছোক্‌রা আসছে ততদিন উন্নতি নেই এর।

তাবলে দলের প্রত্যেকটি লোক তার সহানুভূতি আর উৎসাহ থেকে বঞ্চিত হয় না।

দুঃখ করে নন্দ মাস্টার—তোদের ওপর রাগ হয় না কেন জানিস? তোরা মুখ্যু হলে হবে কি, তোরাই তো চাষা-ভূষোদের শেখাচ্ছিস। শেখাচ্ছিস—ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়। কিন্তু এ ভাবে তো আর চলবে না। সেই মান্ধাতা আমলের নাটক—সেই একঘেঁয়ে প্যাঁচ্ আর বিনিয়ে বিনিয়ে প্রাণনাথ প্রাণনাথ…আক্ষেপে ফেটে বলে নন্দ মাস্টার—ওঃ! সব যদি ঢেলে সাজতে পারতুম! আর বলতে বলতে উদাস হয়ে যায়।

অধিকারী বলে—নাও, নাও আর ঢালতে হবে না। যা ঢালছ তারই ঠেলায় অন্ধকার? বায়না ছাড়তে পথ পাচ্ছিনা। এর ওপর উনি আবার ঢেলে সাজবেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দ মাস্টার বলে—অধিকারী, তুমি বুঝছ না! যুগও পাল্টাচ্ছে। এখন শুধু তরোয়াল ঘুরিয়ে আসর মাৎ করলে চলবে না। দর্শকদের মনের ভেতর ঢুকতে হবে।

অধিকারী বিস্মিত হয়ে বলে—মনে ঢুকবে কি হে?

নন্দ মাস্টার উত্তর দেয়—শুধু রাম-রাবণ আর কুরু-পাণ্ডব নিয়ে আর চলবে না। চোখের জল পাল্টাতে হবে, সাজপোশাক পাল্টাতে হবে, অ্যাকটিং পাল্টাতে হবে—হুঁকো-নলচে মায় কল্কে পর্য্যন্ত পাল্টাতে হবে!

অধিকারী চোখ কপালে তুলে বলে—বাকী আর রইল কি নন্দ?

নন্দ মাস্টার বলে—থাকল সবই, শুধু কোঁৎকা-কুঁৎকি বন্ধ রেখে প্রেমরসে ভাসতে হবে!

অধিকারী দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে—ক'ছিলিম টেনেছ শুনি?

নন্দ মাস্টার ম্লান হাসে আর বলে—ছিলিমে ভুল বক্‌ছি না দাদা—আর মদ, তাড়ী, গাঁজা-ভাঙ বলছ? সে তো আমাদের খাদ্য হয়ে গেছে ভাই!

পেট ভর্তি একটা কিছু চাই ত? ভাত না পাই গাঁজার ধোঁয়াই যথেষ্ট আর খরচাও কম!

উত্তেজিত নন্দ মাস্টার হাঁফাতে থাকে। তারপর একসময় অনুরোধ করে অধিকারীকে—শোন অধিকারী, এই সব অগা-বগা ছেড়ে আমার 'ধ্রুব' পালাটি এবার জুড়ে দাও!

ব্যাপারটি আর কিছুই নয়। নন্দ মাস্টার চায় যাত্রাজগতের একটা পরিবর্তন। এই গতানুগতিকতায় সে হাঁফিয়ে উঠেছে। ভয় পেয়েছে, যাত্রাশিল্প বুঝি ডুবে যায়। সে বুঝতে পেরেছে এই অতি পুরাতনের মধ্যে নোতুনের কিছু আস্বাদ না দিতে পারলে যাত্রা-জগৎ একটা চরম বিপদের সামনে এসে দাঁড়াবে। তাই ছোট ছেলের সেন্টিমেণ্ট নিয়ে—নোতুন নাটকের সঙ্গে একটা নোতুন ভাবের গোড়াপত্তন করতে চায় সে।

এই নোতুনের ইঙ্গিতে অধিকারী আর নন্দ মাস্টারের মধ্যে প্রায়ই হাতা-হাতি হবার উপক্রম হলেও অধিকারীর মনটা ধীরে ধীরে নন্দ মাস্টারের কথায় ভিজতে শুরু করে।

আজ এই ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখবার পর থেকেই নন্দ মাস্টারের মনে হয়েছে এইবার সে বোধহয় পারবে যাত্রা জীবনের মোড় ঘোড়াতে।

ছেলেটির চা খাওয়া হল। সে তার ডাগর চোখ দুটো দিয়ে যেন গিলতে লাগল দলের সবাইকে।

এক সময় সস্নেহে নন্দ মাস্টার বলল,—হাঁরে, তুই বললি তোর মা-বাপ কেউ নেই—থাকিস মামার কাছে—মামা তোকে ভারী কষ্ট দেয়—এদিকে লেখাপড়া শেখার খুব ইচ্ছে আছে—মামা তোকে ইস্কুলে না দিয়ে তার দোকানে মাল ওজন করায়। তবে তুই থাকিস্ কেন সেখানে?

করুণ অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলেটি বলে—কোথায় যাব বলুন? আমার আর কেউ নেই যে।

এক মুহূর্ত থেমে কাঁপা স্বরে নন্দ মাস্টার বলল—যাত্রা তোর কেমন লাগে র‍্যা?

উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে ছেলেটি বলল—যাত্রা! ভয়ানক—ভয়ানক ভালো লাগে।

খুব খুশী হয় নন্দ মাস্টার। খুশীর আবেগে টপ করে বলে ফেলে,—আমাদের দলে যাত্রা করবি তুই?

চমকে ওঠে ছেলেটি। পরমুহূর্তেই আনন্দের আবেগে নন্দ মাস্টারের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ব্যাকুল হয়ে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, করব। যেখানে যেতে বলেন যাবো। দেখবেন আমি ঠিক পারবো। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু'চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে—আচ্ছা আমিও ঐ রকম ঝক্‌মকে পোশাক পরতে পাব?—গান? হাঁ জানি বৈকি।—শুনবেন? শুনুন না। বলে, সে স্টেশনের অন্ধভিখিরীটার নকল করে গান ধরে দেয়,—'তোমার কর্ম তুমি কর মা—'

নন্দ মাস্টার বিস্মিত হল তার মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনে। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে দু'একজন বলল—ওর কথা আর বলবেন না মশায়। যাত্রা পাগলা। যেখানেই যাত্রা হোক্—ও ঠিক সেখানে হাজির হবেই। এত মারও খায় মামার কাছে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বুঝছেন না, বাপ-মা নেই তো, মাথাটা তাই একটু ক্যারাক্ হয়ে গেছে।

নন্দ মাস্টার উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে—না না। বাপ-মার জন্যে নয়। ও হচ্ছে বর্ণ আর্টিস্ট! দুনিয়ায় যত নামজাদা আর্টিস্ট আছে তাদের সবারই মাথা ক্যারাক। ক্যারাক না হলে আর্টিস্ট হয়? বড় হয়? নন্দ মাস্টারের লোভ হয়। আহা! সত্যিই যদি ছেলেটিকে পাওয়া যায় তাহলে ওকে ধ্রুব সাজিয়ে আসর মাৎ করে দিতে পারবে সে।

অধিকারী শুনে লাফিয়ে ওঠে—এ্যাঁ—বল কি হে! শেষ কালে কি আমার হাতে হাতকড়ি পরাতে চাও নাকি হে? পগিয়ে পাগিয়ে নিয়ে যাবে মানে? ছেলে চুরির দায়ে ফেলতে চাও আমাকে? না-না—ওসব চলবে না! 'ধ্রুব' আমার মাথায় থাক্। যা হচ্ছে তাই হোক।

ছেলেটি কিন্তু আকুল হয়ে নন্দ মাস্টারের দিকে চেয়েই থাকে। নন্দ মাস্টার তার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, ব্যথাকাতর করুণ কণ্ঠে বলে—যাও বাবা, ঘরে যাও! লক্ষ্মী ছেলেটির মত বড় হও। বড় হয়ে মামার মুদিখানায় খাঁটি আর ভেজালের বেসাতি করে দু'পয়সা কর। তারপর ও পাড়ার ক্ষেন্তিকে বিয়ে করে এক পাল ছেলে পুলের বাপ হয়ে একদিন পট্ করে অক্কা পেয়ে রাম-যাত্রা করগে।

ছেলেটি বিমর্ষ হয়ে যায়। কাতর চোখ দুটি তুলে চেয়ে থাকে নন্দ মাস্টারের দিকে।

তিন

দিন দুই যাত্রা হল। দু'দিনই ছেলেটি গ্রীনরুমের আশে পাশে ঘুরে বেড়ালো তার ডাগর ডাগর চোখে রাজ্যের হতাশা নিয়ে। ওর ব্যথা কাতর হতাশ মূর্তিটার দিকে চেয়ে নন্দ একসময় বলল—ওটা একটা দামী পাথর ছিলরে,—পাড়াগাঁয়ের পাঁকেই পড়ে রইল!

যাত্রা শেষে আবার পথ পরিক্রমা শুরু হল ওদের। স্টেশনে এসে সব জমায়েত হল। অধিকারী ব্যস্ত-সমস্ত। কোথায় লাঠি, কোথায় তরোয়াল আর গেরুয়ার বাণ্ডিল! কি এলো কি গেলো—এই সব হিসেব-নিকেশের মধ্যে মাস্টারের আক্ষেপ শোনা গেল—হাতে পেয়ে জ্যান্ত ধ্রুব ছেড়ে দিয়ে এলাম রে।

অভিনেতাদের কোলাহল আর তর্কাতর্কির মধ্যে ট্রেন এসে পড়ল। হুড়দাড় করে মালপত্র নিয়ে যে যার উঠে পড়ল গাড়ীতে। ব্যস্ত অধিকারী আরেকবার সব তদারক করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে ভীম-দুঃশাসনের গদাজোড়া প্লাটফর্মে একটা রেলিঙ এর গায়ে তখনও ঠেস দেওয়া পড়ে রয়েছে। দলের সবাইকে বাপান্ত করতে করতে সে বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে গদাজোড়া তুলে নিয়ে লাফিয়ে এসে গাড়ীতে উঠল। গাড়ী তখন চলতে শুরু করে দিয়েছে।

কামরার মধ্যে ওদিকের একটা বেঞ্চে একটা পোট্‌লা মাথায় দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে ভাবছিল নন্দমাস্টার তার জ্যান্ত ধ্রুবর কথা।

অধিকারী খচ্‌ খচ্‌ করতে করতে এসে বসল তার সামনের বেঞ্চে। বলল—মাস্টার, তুমি তো খালি আমাকে চেঁচাতেই দেখ! আমি কি সাধে চেঁচাই বাপু! অলপ্পেয়ে হাড়হাবাতেদের কাণ্ডটা একবার দেখ। এমন গদাজোড়া আমার আর একটু হলেই তো ঘুচ্‌চেছিল। হায়-হায়-হায়! এমন গদাজোড়া গেলে কি ক্ষতিটা আমার হোত' বলদিকিন? আর কারো দলে আছে এমন চিত্তির করা সেগুন কাঠের গদা? আর তেমনি হয়েছে

আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা? ব্যাটাচ্ছেলে খালি নেশা করবে আর আড্ডা মারবে। বাপ্-ব্যাটা যে খেটে খেটে মরছে সেদিকে খেয়াল নেই বাবুর! আমি মরলে ও হতভাগা আমার এতদিনের দলটাকে নির্ঘাত উঠিয়ে ছাড়বে! আমি···হঠাৎ থমকে গেল অধিকারী নন্দ মাস্টারের দিকে চেয়ে। দেখল নন্দ মাস্টার তার কোন কথাই শুনছে না। সে যেন ভাবরাজ্যে ভাসছে।

অধিকারী যেন একটা কিছু আন্দাজ করেছে এমন ভাব করে নন্দ মাস্টারকে ভীত কণ্ঠে বলল—মাস্টার, অ-মাস্টার—বলি কোন নোতুন পালা-টালা আঁটছ বুঝি? তারপর তাকে সাবধান করে আবার বলে—দেখ বাপু, এখন কোন নোতুন পালার গন্ধ আমার নাকে যেন ঢুকিও না—ভাল হবে না কিন্তু! এই 'কুরুক্ষেত্র' দিয়েই এ সীজনটা চালাও!— অ মাস্টার-মাস্টার।

এমন সময় চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সেই ছেলেটি। তাকে দেখে চমকে উঠে অধিকারী বলল—ও বাবা! একি ছেলেরে বাবা! একে দেখলে যে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনও হার্টফেল করত—এ্যাঁ!—অ-নন্দ!

নন্দ মাস্টার তখন উঠে বসেছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা খুশীর হাসি। ছেলেটি সোজা নন্দ মাস্টারের দিকে এগিয়ে এল হাঁফাতে হাঁফাতে। নন্দ মাস্টার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। তারপর চুপিচুপি তাকে কৌতুহলের সুরে জিজ্ঞাসা করল—কি করে এলি র‍্যা?

ছেলেটি মুচ্‌কি হেসে বলল,—পালিয়ে এলাম। আর যাবোনা ফিরে!

তার পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নন্দ মাস্টার বলল—সাবাশ! তারপর কণ্ঠে একটু আবেগ মিলিয়ে বলল—এক, বস্ত্রে গৃহত্যাগ করলি বাপ্! ঠিক আছে! দুনিয়ায় যত বড বড় আর্টিস্ট নাম করেছে না—সব তোর মত এই সংসার ছাড়া কাজ করেছিল বলেই তারা আর্টিস্ট হতে পেরেছিল!

ছেলেটি গদগদ কণ্ঠে প্রশ্ন করল—আমি—আমিও আর্টিস্ট হতে পারব?

নন্দ মাস্টারের দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। সে তখন দেখছে ভবিষ্যতের ছবি—তার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা 'ধ্রুব' নাটকের জয়যাত্রা। তার নাটকের আল্পনা জীবন্ত হয়ে সারা বাংলাকে ভক্তির তোড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের চোখের জলে তার 'ধ্রুব' কাতর কণ্ঠে ডাকছে—'কোথায় তুমি শত্রুনিসূদন পরমপুরুষ নরসিংহদেব—একবার এস গো! এস, এই অত্যাচার

অবিচারের কণ্ঠরোধ করতে তোমার স্বরূপে। 'ধ্রুব'র স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেখা দাও, দেখা দাও প্রভু!'

ধীরে ধীরে ছেলেটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নন্দ মাস্টার গাঢ়স্বরে বললো—শুধু রঙ মেখে, সাজপোশাক পরলেই আর্টিস্ট হওয়া যায় না, বাপ্! আর্টিস্ট হতে হলে তোকে সাধনা করতে হবে। রাগ, শোক, দুঃখ অহংকারকে ছাড়তে হবে। কোনদিন খেতে পেলিনা—কুছপরোয়া নেই। শোবার বিছানা নেই—ফুটপাথে ইঁট মাথায় রেখে নাক ডেকে ঘুমোতে হবে। নিজে যখন কাঁদবি তখন পরকে হাসাতে হবে।—এই ত' আর্টিস্ট! হ্যাঁ—এই ত' আমাদের জীবন!—তোর নাম কি র‍্যা?

পরম উৎসাহ ভরে ছেলেটি বলল—বৈকুণ্ঠ রায়।

চমকে উঠে নন্দ মাস্টার বলে—সর্বনাশ! ও সব কণ্ঠ-ফণ্ঠ হলে তো চলবে না বাপ্। মিষ্টি নাম চাই। এমন নাম চাই, যাতে লোকে হায় হায় করে উঠবে! তোকে আজ থেকে দিবাকর বলে ডাকবো। হ্যাঁ,—দিবাকর।

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—দিবাকর!

নন্দ মাস্টার আবেগের সুরে বলে—কি মুখ! কি চোখ! কি দেহের গড়ন পেয়েছিস, বাপ্! একেবারে কী সাক্ষাৎ ধ্রুব হয়ে জন্মেছিস!

ছাই চাপা আগুন—না না,—আগুন না, সূর্য! দাউ দাউ করে জ্বলছে আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারকে সরিয়ে আলোয় আলোয় ঝলমল করে দিচ্ছে! সেই সূর্য—সেই দিবাকর তুই! দিবাকরের মত জ্বলে উঠে যাত্রা জগতের সব অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দিতে পারবি? পারবি র‍্যা যাত্রাদলের লোকগুলোকে আলোয় আনতে?

বুঝতে পারে না বালক বৈকুণ্ঠ—কি বেদনা, কিসের যন্ত্রণায় নন্দ মাস্টার এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে না যাত্রা জগতের অন্ধকারটা কি? তবু সোৎসাহে বলে ওঠে—পারবো, নিশ্চয় পারবো। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন কি করলে পারব?

নন্দ মাস্টার তাকে আবেগে বুকে চেপে ধরে বলে উঠল—পারবি, তুই সত্যিই পারবি! তোর চোখে মুখে সে কথা ফুটে উঠেছে। তোর হাত নাড়ায়—চলার ভঙ্গিমায় আর মিষ্টি মিষ্টি হাসির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি রে মান্ধাতা আমলের যাত্রা জগৎটা ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে—তারা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে!

চার

নন্দ মাস্টার দিবাকরকে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতেই রাখল। সব ভুলে ওকে শেখাতে লাগল গান, বাচন-ভঙ্গিমার কৌশল, দাঁড়াবার ভঙ্গি। অভিনয়ের সব কিছু মন্ত্র সে উজাড় করে দিতে লাগল দিবাকরকে। যেন কেটে কেটে এক ভাস্কর তৈরী করছে এক বিচিত্র লীলায়িত মূর্তি। শুধু তাই নয়, নন্দ মাস্টার তাকে শোনাত তার জীবনের ইতিবৃত্ত। অভিনয় জীবনকে মহৎ আর মহিমময় করে দেখাতো আর শোনাতো কত ভালবাসে নন্দ মাস্টার তার এই যাত্রা জীবনকে। তার এই 'বিমলা অপেরাকে'।

বলতে বলতে নন্দ মাস্টার উত্তেজিত হয়ে পড়ত। ভাব-কম্পিত গম্ভীর কণ্ঠে বলত--এরা খেতে পায়না। পরণে ছেঁড়া কাপড়—ছেলেপুলেদের মানুষ করতে পারে না,—তবু কিসের মোহে এরা এখানে পড়ে থাকে তা জানিস দিবাকর? এরা সত্যিকারের শিল্পী। এরা বরুণ আর্টিস্ট। স্রষ্টিকার। সেই সৃষ্টির আনন্দে এরা ভরপুর। এরা মানুষকে ন্যায়, ধর্ম, সত্য পালন করতে বলে। এরা মানুষকে মানুষের মত থাকতে বলে, অথচ কেউ এদের মানুষ বলে মানে না। এরা হাজার হাজার মানুষকে কাঁদাচ্ছে, হাসাচ্ছে, কত উপকরণে তাদের মন ভরিয়ে তুলছে,—অথচ এদেরই স্থান নেই সমাজে। এদের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না—এদের আত্মীয় বলে সম্বোধন করতে পরম আত্মীয়রাও লজ্জা পায়। ঘৃণা, অবজ্ঞা আর অবহেলার মধ্যে এরা মানুষকে মানুষের মত ভালবাসতে শেখাচ্ছে, তবু এদের কেউ সম্মান দেয় না দিবাকর।—তুই কি এদের সম্মানিত করতে পারবি—পারবি, বাবা? আমিতো পারলাম না—শেষ হয়ে গেছি! হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে নন্দ মাস্টার।

গভীর শ্রদ্ধা আর পরম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দিবাকর তাঁর গুরুর দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে বলে—পারবো—নিশ্চয়ই পারবো!

পাঁচ

কিছুদিন পরে এক শুভদিনে শুভক্ষণে দিবাকর আসরে নামে। নন্দ মাস্টার তাকে ছোট নন্দদুলাল বলে পরিচিত করে দেয়। আসরে তার ভাব সমাহিত অভিনয়ে আর মিষ্টি গানের সুরে দিবাকর বিখ্যাত হয়ে ওঠে দিনে দিনে। সে কখনো সাজে 'ধ্রুব', কখনো 'তরণীসেন' কখনো 'বৃষকেতু'।

এরপর একদিন সেই ছোট্ট ফুটফুটে দিবাকর বড় হয়ে উঠল। আজ আর সে বৃষকেতু নয়—সেজেছে কর্ণ। উদার গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। সুন্দর কান্তিমান চেহারা। সমস্ত আসর মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে তার অভিনয়। অভিনয়ান্তে দর্শকের হর্ষোৎফুল্ল হাততালি—আনন্দ ধ্বনির প্রচণ্ড অভিব্যক্তি! সারা আসর প্রতিভাধর দিবাকরের গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ নন্দ মাস্টারের চোখ দুটি আজ আনন্দাশ্রুতে ভিজে। সেদিনের সেই ছোট্ট দিবাকর, আজ হয়ে উঠেছে খ্যাতিমান নট দিবাকর। ফুলের মালা, মেডেল আর স্তূপীকৃত উপহারগুলোর দিকে চেয়ে দিবাকরের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে, গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে। বৃদ্ধ নন্দ মাস্টার পলকহীন নয়নে চেয়ে থাকে দিবাকরের দিকে। আর সে চোখে একটা খুশীর দীপ্তি চক্‌চক্ করে।

কিন্তু এত অভিনন্দনেও তৃপ্ত হতে পারে না দিবাকর। যখন দেখে আসর ভেঙে গেলে তাদের খেতে দেওয়া হয় বাবুদের বাড়ীর বাইরের রকে। শাল-পাতার ওপর ড্যালা ড্যালা ভাত, কুমড়োর ঘ্যাঁট আর জলের মত পাতলা ডাল। ছোট ছোট ছেলে যারা আছে সখীর সারিতে, তাদের যখন সে ক্ষুধার্ত কুকুরের মত খাওয়ার শেষে শালপাতা চাটতে দেখে, তখনই তার মন বিদ্রোহ করে ওঠে। নিজের হাত নিজে কামড়ে ধরে। এই নিয়ে বারোয়ারীর বা আসরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঝগড়াও করে। তার পরিবর্তে পায় অবমাননা আর লাঞ্ছনা। শুনতে হয় তাকে 'যাত্রাদলের ছোকরা, তার আবার আস্পা কত!' ফাটা বেলুনের মত চুপসে যায় দিবাকর। পরক্ষণেই ভাবে, দোষ এদের নয়, দোষ তাদের ; দোষ গোটা যাত্রা জগৎটার।

রাতের পর রাত দিবাকর শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে,—এই যে জীবন—এ জীবনের স্বীকৃতি কোথায়? কোন পথে তার সাফল্য?

ভাবতে ভাবতে সে উঠে দাঁড়ায়। সমস্যার সমাধান না করতে পেরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাতের কাজল কালো অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে। একটা কিছু করতে হবে। একটা কিছু। সব মানুষের মঙ্গল—যে মঙ্গলের পথ ধরে তাদের আসবে স্বীকৃতি—তাদের আসবে পরিচিতি মানুষ বলে। কিন্তু, কি সে মহৎ—কি সে মঙ্গলের অনুষ্ঠান! জানালার গরাদে মাথা রেখে ভাবে দিবাকর। আধো-আলো, আধো-আঁধারের মধ্যে তার নয়নপটে ভেসে ওঠে দেওয়াল আলমারীতে রাখা কাপ, মেডেল ও নানা রকমের উপহার সামগ্রীগুলোর ছবি। পেরেকে ঝোলান কয়েকটি শুকনো ফুলের মালা। সে দিকে চেয়ে ভাবে দিবাকর,—ঐ কি তার স্বীকৃতি? এ ত' তারা ওকে দেয়নি—দিয়েছে কর্ণকে, অর্জুনকে, রামকে, নারায়ণকে, শ্রীকৃষ্ণকে। মানুষ দিবাকরকে কি দিয়েছে তারা? দিয়েছে এই নির্বাসন। এই বিমলা অপেরা পার্টির একটা বদ্ধ কক্ষের পৃথিবীটুকু! এর বাইরে তার পরিচয় কি? যাত্রাদলের ছোকরা?

যাত্রার আসরে যে মেয়েটি চিকের আড়ালে সব লজ্জা, সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দুটি ডাগর চোখ তুলে পরম শ্রদ্ধা ভরে চেয়ে থাকে শ্রীরামের দিকে, সেই মেয়েটিই পরের দিন দিবাকরকে দেখে ঘৃণায় চোখ নামিয়ে পালিয়ে যায়। পথের ধারে কুষ্ঠ রোগীকে দেখলে মানুষ যেমন করে সরে যায়, ঠিক তেমনি করে।

যে বৃদ্ধরা তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, আর পুরস্কার দেন,—সেই তাঁরাই পরের দিন দিবাকরকে বলেন—সারা জীবন যাত্রা করেই কাটাবে নাকি হে? এমন কেন হয়? কেন তার প্রতিভা, তার ত্যাগ, তার এই নিষ্ঠাকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখে!

এ নিয়ে সে আলোচনা করেছে নন্দ মাস্টারের সঙ্গে,—কিন্তু কোন সদুত্তর পায়নি। নন্দ মাস্টার বলেছে,—একদিন তোমার মত আমিও ক্ষেপে যেতুম দিবাকর। ইচ্ছে হত গোটা সভ্য সমাজের মানুষগুলোর বুকে চেপে বসে তাদের জিভ্ টেনে ছিঁড়ে দি—কিন্তু…।

চোখ দুটো জলে ভরে যায় বৃদ্ধ নন্দ মাস্টারের। বলে,—রং মেখে আমরা যতক্ষণ আসরে থাকি ততক্ষণই আমাদের লোকে ভালোবাসে বাবা।

কিন্তু আসরের বাইরে আমাদের কথা আর কেউ মনেও রাখে না।—আমি তো দেখলাম অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু পারলাম না। এবার তোমার হাতে তুলে দিয়েছি সে ভার। চেষ্টা করে দেখ যদি পার! আমার দিনতো শেষ হয়েই গেছে!

ভেঙ্গে পরে দিবাকর। মন তার কেঁদে ওঠে। তবে কি কোন উপায় নেই? চিরটাকাল শুধু রঙ্গ-তামাসা করে মানুষের মনোরঞ্জন করেই কাটাতে হবে? কেউ ভাববে না তাদের কথা? যাত্রা-শিল্প আর যাত্রা-শিল্পীরা কি চির অবহেলিত হয়েই থাকবে?

অথচ এই যাত্রা ছিল ভারতীয়দের একটি বিরাট সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি। কেন—কিসের জন্যে হঠাৎ এই বিস্মরণ? এ শিল্প কি শাশ্বত নয়? এর কি বুনীয়াদ কাঁচা মাটির ওপর? একি ভুল পথ ধরে নিজের সত্বাকে বজায় রাখবার হাস্যাস্পদ প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছে?

অথচ থিয়েটার সিনেমার স্বীকৃতি—সর্বজন আদৃত সে এক বিস্ময়কর শিল্প।

ভাবতে থাকে দিবাকর—গলদ কোথায়, কি তার ভুল পদক্ষেপ? হঠাৎ তার মনে হয়, শুধু রামায়ণ-মহাভারতের হাজার হাজার বছরের মর্মীদের তুলে এনে মানুষের সামনে দাঁড় করালে চলবে না। জীবন্ত শাশ্বত, পরম মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে নতুন পথের সন্ধান না দিতে পারলে এ শিল্পের স্বীকৃতি নেই।

কিন্তু কি সে বাস্তব জীবন্ত রূপ, যা নিয়ে মানুষের কাছে মঙ্গলের অমৃত ভাণ্ড তুলে ধরবে সে?

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেজে ওঠে চারটে বাজার সঙ্কেত। আকাশটা ধূসর হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের বুকে ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে। পূব দিকটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবার দুরাশায় অন্ধকারকে দু'হাত দিয়ে ঠেলছে যেন।

ছয়

কিছু কাল পরে অধিকারী মারা গেল। তারপর হঠাৎ একদিন নন্দ মাষ্টারও মারা গেল। যাবার সময় দিবাকরকে বলে—তোমার কাছে আমার সব কিছু রেখে গেলাম দিবাকর। যেদিন সত্যিই তুমি অন্ধকারকে দূর করে আলো আনতে পারবে, সেই দিন আমার আত্মা মুক্তি পাবে।

চোখের জলে ভেসে দিবাকর বলল—আপনার আশা আমি পূর্ণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব মাস্টার মশাই।

সে কথা শুনে পরম শান্তিতে নন্দ মাস্টার চোখ বুজল।

এরপর 'বিমলা-অপেরা'র অধিকারী হয় গদাধরের ছেলে শ্যামলাল। অধিকারীর গদীতে বসেই সে তার বাবার মত মেজাজ নিয়ে অধিকারীগিরি করতে লাগল।

দিবাকর হল অধিনায়ক। এখন সে অবশ্য ছোটনন্দ বলেই বিখ্যাত হয়েছে। নন্দ মাস্টারই তাকে এই নাম দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন,—তোর মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব দিবাকর, তাই আমার নামটাই তোকে দিলাম।

শ্যামলাল অধিকারী হলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে এইটা দিবাকর আশা করেছিল। কিন্তু সে এই পদে আসার সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর বুঝতে পারল, বাপ ছেলেতে কোন তফাৎ নেই।

শ্যামলাল মুখ্যু মানুষ, নোতুন কিছু করার নামে তার চোখ কপালে ওঠে। ভালো পোশাক, ভালো নাটক, ভালো অভিনেতা দিয়ে বিমলা অপেরাকে নোতুন করে গড়ার নামে সে চমকে ওঠে। সে স্পষ্ট জানায়—তুমি যদি এসব কর তাহলে দল তুলে দিয়ে চিটে গুড়ের কারবার ফাঁদব আমি।

মুষড়ে পড়ে দিবাকর। মন তার তিক্ততায় ভরে ওঠে। মনে হয়, এখুনি চলে যায় দল ছেড়ে—শুধু দল ছেড়ে নয়, এই, এই অভিশপ্ত শিল্প সাধনা ছেড়ে।

কিন্তু পারে না। দলের অন্য অভিনেতাদের ব্যথা-কাতর করুণ অসহায় মুখগুলির দিকে চেয়ে সে যেন কেমন বোবা হয়ে যায়। মনে পড়ে নন্দ মাস্টারের কথা—দেখবি, দেখবি, একদিন যাত্রাজগতের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। নোতুন সূর্যের আলোর ছটায় সারা যাত্রা-জগৎটা ঝলমল করছে! মনে বল পায় দিবাকর।

শ্যামলাল বলে—হুঁ, যাত্রাদলের ছোকরার আবার এ্যাঁ-ত্যাখ না। যাত্রা করিস যাত্রাই কর—তা নয় বলে থ্যাটোর বাস্কোপের পিলিয়াররা দেশজোড়া নাম পেতে পারে, গবরমেণ্টো থেকে মানপত্তর পেতে পারে তো যাত্রাপার্টীর পিলিয়ার পাবে না কেন? শোন কথা!

অভিমানাহত দিবাকব চলে যায় সেখান থেকে।

তারপব সেই মান্ধাতা আমলের জয় তিলক পরেই আবার দিবাকরের যাত্রা শুরু হয়। শুধু আশাটুকুই তার সার সম্বল। সে চেষ্টা করে চলে। নাটক লেখা শুরু করে। এমন নাটক, যে নাটক দিয়ে সে সারা দেশকে বোঝাবে যে, যাত্রা একটা ঘৃণ্য বস্তু নয়, যাত্রার স্থান সবার উপরে। যে নাটক দেখে লোকে শুধু ধন্য ধন্য করবে না, ভাববে, বুঝবে আর শিখবেও অনেক কিছু।

কত গাঁ, কত জনপদ, কত শহরের বুকে ঘুরতে থাকে দিবাকর তার দল আর মান্ধাতা আমলের সেই সব নাটক নিয়ে।

কালের মন্দিরা বাজিয়ে চলে যায় দিন, চলে যায় বছরের পর বছর। কত পরিবর্তন ঘটে পৃথিবীর। কত উত্থান-পতন হয়। দিবাকর কিন্তু এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও। তাব স্বপ্ন অসফলই থেকে গেছে।

হঠাৎ একদিন সে বিদ্রোহ করে বসে। অধিকারীকে স্পষ্ট জানায়—হয় আমাকে তুমি নোতুন কিছু করবার সুযোগ দাও, আর নয় রেহাই দাও। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মতো অধিকারীরাই আজ যাত্রাজীবনের বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকাণ্ড বাধার মত তোমরা আমার পথ রোধ করে রেখেছ।

সে তার বহু পরিশ্রমে লেখা সত্য, ন্যায় আর ধর্মের জন্য যে চরিত্রটি আজ হাজার হাজার বছর ধরে অমর হয়ে আছে তারি আত্মকাহিনী—সেই অবিনশ্বর চরিত্র যুধিষ্ঠির এর মহাপ্রস্থানের পথের আলেখ্য নিয়ে রচিত 'যুধিষ্ঠির' এব পাণ্ডুলিপিখানি তুলে দেয় অধিকারীর হাতে। তাকে বুঝিয়ে

বলে—সব কিছু বন্ধ রেখে এস এই নাটক নিয়ে পড়ি। নোতুন রঙে, নোতুন ঢঙে, নোতুন সজ্জায় সাজিয়ে তুলি একে। দেখবে রাতারাতি পাল্টে গেছে যাত্রাজীবনের চেহারা। যাত্রা আর ঘৃণিত, অবহেলিত হয়ে থাকবেনা।

অধিকারী শ্যামলাল প্রমাদ গনে। ভাবে, তার বাবার এত দিনের দলটির এই বার বুঝি দফারফা হয়। হয়তো এইবার বিমলা অপেরার পালা চুকল বলে। অনেক অনুনয়-বিনয়ে শান্ত করতে না পেরে অধিকারী তার শেষ অস্ত্র ছাড়ল, বলল—দল বন্ধ করে দোব।

সে জানে দিবাকর বিমলা অপেরাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে আর ভালোবাসে এ দলের প্রতিটি শিল্পীকে। এদের ছেড়ে সে যেতে পারবেনা। হলও তাই। দল বন্ধ হবে শুনে আবার থম্‌কে গেল দিবাকর। মুখ বুজে নীরব হয়ে রইল। মনের ভেতর শুরু হল জ্বলুনি। কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় দিন রাত ছট্‌ ফট্‌ করতে লাগল দিবাকর। মাস্টারের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে জানায় তার অক্ষমতার কথা,—'পারলাম না মাস্টার মশাই, পারলাম না। আমি এদের আলোয় আনবার চেষ্টা করলে কি হবে—এরা আলোয় মুখ দেখাতে ভয় পায়—'

হু-হু করে কেঁদে ওঠে দিবাকর মাস্টারের ছবির ওপর মাথা রেখে।

সাত

এরপর একদিন দিবাকর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলনা। পারলনা 'বিমলা অপেরার' মুখ চেয়ে নীরবে অপমান সহ্য করতে। নিজের সত্তাকে তিলে তিলে বিসর্জন দিতে। একদিন সত্যিই তার বড় সাধের 'বিমলা অপেরা' তাকে ছাড়তেই হল।

সেদিন পলাশডাঙ্গার আর ভুবনডাঙ্গার লোক বায়না করতে এল। ভুবনডাঙ্গার রাসু রায় আর পলাশডাঙ্গার নরপতি সুর।

শিবরাত্রে তাদের গ্রামে পালা গাইতে হবে। পালা চাই 'দক্ষযজ্ঞ' আর চাই ছোট নন্দকে। পলাশডাঙ্গার নরপতি সুর আগে এসে তিনশো টাকায় বায়না করলে। তার কিছু পরে ভুবনডাঙ্গার রাসু রায় এসে দেখল তার পাশের গ্রামের নরপতি সুর আগেই বিমলা অপেরাকে গেঁথে বসে আছে। সে আরও দু'শো টাকা বাড়ালে। অর্থপিশাচ শ্যামলাল বেসরমের মত নরপতির তিনশো টাকার বায়না বাতিল করলো। নরপতির হাতে তার বায়নার টাকা ফেরৎ দিয়ে খুশী মনে রাসু রায়ের নামেই বায়না লিখল।

নরপতি যাবার সময় শাসিয়ে গেল—দেখব কেমন করে ভুবনডাঙ্গার লোক বিমলা অপেরার ছোট নন্দর পেলে দেখে।

ওরা চলে যাবার পর দিবাকর আপত্তি করল। দিবাকর বললো—এ কাজটা খুব অন্যায় হয়েছে।

মূর্খ শ্যামলালকে সে নানাভাবে চেষ্টা করেও বোঝাতে পারলো না যে এ ধরনের ব্যাপার হতে থাকলে দল বাঁচবে না। বদনাম হয়ে যাবে দলের।

শ্যামলাল তাকে দমিয়ে দিয়ে বলল—ব্যবসা—ব্যবসা, বোয়েচ? এখানে তোমার ঐ 'ডিস্টিপিলিন' দেখালে চলবে না—হুঁ!

শিবরাত্রের দিন ভুবনডাঙ্গায় যাত্রার আসর জমে উঠেছে। 'দক্ষযজ্ঞ' পালা। সারা আসরটা ছোট নন্দর অভিনয়ে [illegible] হয়ে আছে। অবাক
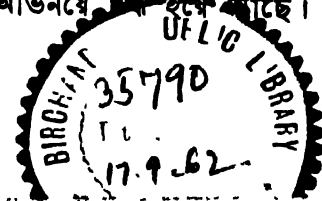
বিস্ময়ে সবাই দেখছে ছোট নন্দর অভূতপূর্ব অভিনয়। একটি হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের শুরু হল। পিত্রালয়ে পতি-নিন্দায় সতী দেহ রাখলেন। উন্মাদ মহাদেব স্বর্গ থেকে এলেন তাঁর ভূত-প্রেত অনুচরদের নিয়ে। ক্ষ্যাপা ভোলানাথ তুলে নিলেন সতীর দেহ নিজ স্কন্ধে। তারপর সুরু করলেন তাণ্ডব-নৃত্য। ভূত-প্রেতেরা 'দক্ষযজ্ঞ' লণ্ড-ভণ্ড করতে লাগল।

এমন সময় আসরের পেছন দিকে একটা চাঞ্চল্য শোনা গেল। চেঁচামেচি —আর্তনাদ, তারপরই প্রচণ্ড কোলাহল—'আগুন! আগুন!'

মেয়েদের কান্না, আর আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠল স্থানটি। পুরুষদের এ ওর মাথা ডিঙ্গিয়ে পালানো, মারামারি হুড়োহুড়িতে সত্যিই দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল।

পলাশডাঙ্গার নরপতি সুরের লোকেরা আসরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

শিববেশী দিবাকর সতীবেশী ননীকে ঘাড়ে করে পালাল ছুটতে ছুটতে।

ভূত-প্রেতের দল ছোটাছুটি করতে করতে মাঠ ময়দান ভেঙ্গে এক গৃহস্থ-বাড়ীর গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিল। গৃহস্থরা ভাবল, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, তাই ভয়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার শুরু করতে পড়শীরা ছুটে এল। মুহূর্তে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠল।

ভূতের দলের হয়ে নবা তার বিকৃত গলায় অনেক কাকুতি মিনতি শুরু করল—আমাদের মারবেন না। আমরা সত্যি ভূত নই গো···সাজা ভূত! পেটের দায়ে ভূত সেজেছি—মাইরি বলছি!

কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা।

এদিকে অধিকারী শ্যামলালকে কে বা কারা চাঁদা করে মারতে মারতে আধমরা করে ছাড়ল—'নিবি আর বায়না—নিবি!'

পরিবেশ শান্ত হয়ে গেলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দিবাকর তার জটা—ত্রিশূল—বাঘছাল সব ননীর হাতে তুলে দিয়ে সুটকেশ থেকে বের করে নিজের কাপড জামা পরে বলল—এই আমার শেষ যাত্রা।

ননী চমকে উঠে বললে—সেকি! তুমি কি হরিদ্বারের দিকে চললে নাকি?

দিবাকর বললে—না। শহরের দিকে যাব। যাত্রা আর করবনা। অনেক হয়েছে। যাত্রা আমি ছেড়ে দিলাম।

অবাক বিস্ময়ে দিবাকরের দিকে চেয়ে ননী বলে—তুমি যাত্রা করা

ছেড়ে দেবে? তোমার বিমলা অপেরাকে ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে চলে যাবে!

দিবাকর ব্যথাভরা কণ্ঠে বললে—ছাড়তে আমারো কষ্ট হচ্ছে ননী, কিন্তু এ ভাবে গরু-ছাগলের মত বেঁচে থাকতে চাই না আর। যদি কখনো তোদের মানুষের মত বাঁচার পথ দেখাতে পারি সেদিনই আবার ফিরে আসব, তার আগে নয়। ধরা গলায় কথাগুলি বলে দিবাকর একবার তাকাল পুড়ে যাওয়া যাত্রার প্যাণ্ডেলটার দিকে। তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আগুনের ফুলকি উড়ে মিশে যাচ্ছে বাতাসে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এগোল স্টেশনের দিকে। তারপর দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেন ছুটে চলেছে। একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় দিবাকর একা চলেছে। মন তার ভার হয়ে আছে। জানালার ধারে বসে সে উদাস হয়ে চেয়ে আছে বাইরের কালো অন্ধকারের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে সে ভাবছে, তার বিমলা অপেরা আর তার দলের লোকজনের কথা। যাদের সঙ্গে সে কাটিয়ে এসেছে জীবনের বহু বর্ষ। ভুলতে পারছেনা নন্দ মাস্টারের কথা। এক সময় তার মনে হল সে যেন একটা মহা অপরাধ করেই চলে এসেছে। যে দায়িত্ব মাস্টার তার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সে তার মূল্য দেয়নি। সে ভীরুর মত পালিয়ে এসেছে। ছটফট করে দিবাকর। ব্যথায় অন্তরটা বার বার মুচড়ে ওঠে। চোখ দুটো জ্বালা করে। চোখের কোণ দুটো দেখতে দেখতে ভিজেও ওঠে জলে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয় দিবাকর। তার মনে হয়—না, না, সে যা করেছে ঠিকই করেছে। এ অভিশপ্ত শিল্প-প্রাণকে সে কোনদিনও শাপমুক্ত করতে পারবে না। তার চেয়ে এর থেকে দূরে থাকাই ভালো। চোখের জল মুছে ফেলল দিবাকর। মুছতে গিয়ে লক্ষ্য করল তার পাঞ্জাবীর হাতায় রঙ লেগে। মনে পড়ল তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে সে মেক্-আপ পর্যন্ত তোলার সময় পায়নি। মুখটা ধোবার জন্য স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে সে ল্যাভাটরির মধ্যে ঢুকে পড়ল, আর ঠিক সেই সময় গাড়ীটা এসে থামল একটা স্টেশনে।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ীটা এসে দাঁড়াতেই একটি রোগা লিক্‌লিকে বকাটে মার্কা ছেলে একটি সুবেশা সুন্দরী অষ্টাদশী তরুণীর হাত ধরে একরকম

টানতে টানতেই এনে হাজির করল একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে।

তরুণীর টানা টানা চোখ দুটোয় কেমন যেন শঙ্কার ছায়া থম্‌থম্‌ করছিল। সে ভয়ে ভয়ে সদ্য থামা ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে ভীতকণ্ঠে ছেলেটিকে বলল,—না বেচুদা আজ রাতের গাড়ীতে আমি কিছুতেই যাব না। বাবা শুনলে বক্‌বে।

বেচুদা,—অর্থাৎ সেই ছেলেটি তার পান খাওয়া দাঁতগুলো বার করে শুকনো দু'খানা হাত দিয়ে মাথার ওপরকার একরাশ রুক্ষ চুলের বোঝাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে খাঁটি মস্তানী ভঙ্গিতে বললো,—আবার সেই পুরনো কথা! তোকে এত করে বলছিনা কোন ভয় নেই। এমন গাড়ী ছেড়ে দিতে আছে? এখান থেকে ছেড়ে শুধু একবার থামবে ঘাসডাঙ্গা—তারপর একস্পীডে একদম হাওড়া। ভোরে বাড়ী পৌঁছে যাব। এমন আরামের গাড়ী আর একটিও নেই এ লাইনে!

তরুণী তার ভীত চোখ দুটি তুলে তাকাল বেচুর দিকে। ভয়ে ভয়ে চাপা স্বরে বলল,—গায়ে এত গয়না রয়েছে শেষে যদি…

তাকে শেষ করতে না দিয়েই বেচু বীরত্ব প্রকাশ করে বলে,—আরে যা-যা! জেনে রাখ গীতা, তোর বেচুদা এই রোগা হাড়ে এখনও ভেল্কি খেলাতে পারে। যত ষণ্ডা-গুণ্ডাই আসুক না কেন, এই রোগা হাতের একটি ঘুঁসি খেলে আর উঠতে হবে না বাছাধনকে—বুইচিস্‌। আয়, আয়, উঠে আয়।

গীতা অর্থাৎ তরুণীটি তবুও ভীত স্বরে আপত্তি জানায়—না বেচুদা আমার কেমন ভয় ভয় করছে। কাল সকালের গাড়ীতেই চল, লক্ষীটি!

একটু বেশী রকম বিরক্ত হয়েই বেচু বলে—তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি—বুইচিস না। আরে বাপু, হবেটা কি শুনি? দিব্বি ফাস্‌কেলাসে চড়ে দোর বন্ধ করে ঘুমোতে ঘুমোতে যাব। ভোরবেলা গিয়ে হাওড়ায় নামব—চুকে যাবে ল্যাটা। কেন এমন কচ্চিস বল দিকি? এ ট্রেনে না গেলে কাল আমার দিনটাই মাটি হয়ে যাবে যে! ম্যাটিনি শো'র আগে পৌঁছতে পারব? নগদ একটাকা চোদ্দ আনা জলে যাবে না? আয় শিগ্‌গির।

বেচু এগোতে যায়, গীতা বলে—উঠো না, একা একা ফার্স্টক্লাসে আমি যাবো না। এ গাড়ীতে যদি যেতেই হয় তাহলে থার্ডক্লাসে চল।

বেচু রাগ হয়, বলে—মাইরি নাকি? নগ্‌দা টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি না? এমন আরাম ছেড়ে ঐ কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসব? তোর যত সব বাজে বায়নাক্কা! আয় চলে আয়, সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে। হুঁ, বলে এই বয়সে কত চোর-গুণ্ডাকে ট্যাঁকে রাখলুম আর ভারী ইয়ে দেখাচ্ছে। আয়, আয় শিগ্‌গির আয়!

স্টেশনের ঘণ্টাটা বেজে ওঠে ঢং ঢং করে। গার্ড হুইসেল দেন। গীতা তখনও ইতস্তত করছে দেখে বেচু চট্‌ করে গীতার একখানা হাত ধরে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—আয় শিগ্‌গির। গাড়ী যে ছেড়ে দিল!

বেচু দ্রুত এগোয় গীতার হাত ধরে। অগত্যা গীতাকেও এগোতে হয়। ওরা এসে ওঠে দিবাকরের কামরাটার মধ্যে। গাড়ী ছেড়ে দেয়। বেচু দরজাটা বন্ধ করে হাতলটা ঘোরাতে যাবে এমন সময় চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে পড়ল বলিষ্ঠ চেহারার একটি লোক। একমুখ চাপ দাড়ি তার। চোখ দুটো ভাঁটার মত। পরণে ময়লা সার্ট আর পায়জামা। গম্ভীর হয়ে সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কামরায়। বেচু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লোকটির গম্ভীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কেমন থমকে গেল। কোন কথা না বলে এসে বসল গীতার পাশে। দু'চোখে তখন শঙ্কার ছায়া নেমেছে গীতার। মনটা বার বার যেন কোন এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে শিউরে উঠছে। লোকটি গম্ভীর হয়ে এসে বসল গীতার সামনা সামনি, অর্থাৎ সামনের বার্থটার ওপরে। সিগারেট খাচ্ছিল সে। এবারে শেষ টান মেরে সিগারেট জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে লোকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গাড়ীটা তখন তীর বেগে ছুটে চলেছে ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তীব্র সিটি বাজাতে বাজাতে। লোকটি এক পা এক পা করে গীতার কাছে এসে দাঁড়াল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল গীতা। চোখ দুটো স্থির হয়ে গেছে তার। সারা দেহটা কাঁপছে থর থর করে। সে বেচুদার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল। অনুভব করল বেচুও কাঁপছে। গম্ভীর স্বরে লোকটি বলল—গায়ের গয়নাগুলো পেলেই আমি চুপ্‌চাপ চলে যাব।

শিউরে উঠল গীতা। অস্ফুটে ভীত কণ্ঠে সে বলল—বেচুদা।

ভয়ে বেচুর শরীরের রক্তও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। তবু সে তার পৌরুষকে আর ছোট করতে পারল না। চেরা বিকৃত শুকনো কণ্ঠে সে বলে উঠল জোরে—এইও—খবরদার—।

চকিতে চোখ দুটো বেচুর দিকে ফেরাল লোকটা। দুচোখে আগুন জ্বেলে বলল—খামোশ। বলেই সে তার কোমর থেকে টেনে বার করল একটা চক্‌চকে ছোরা। ছোরা দেখে বেচু কাঠ হয়ে গেল ভয়ে। গীতা কেঁদে ফেলল ছেলেমানুষের মত। লোকটা গম্ভীর স্বরে বলল—গয়না পেলে আমি আর কিছু বলব না। ওগুলো নিয়ে এক্ষুণি নেবে যাব। দিয়ে দিন গয়নাগুলো—শিগ্‌গির!

বেচু মুখ খোলে এবার। গীতাকে বলে—গীতা, দিয়ে দে ওগুলো। আরে ভারী তো ক'খানা গয়না। প্রাণে বাঁচলে মামা তোকে আরও অনেক গড়িয়ে দিতে পারবেন। দিয়ে দে, দাদাকে চটিয়ে লাভ নেই, বুইচিস!

কাঁদতে কাঁদতে গীতা এক এক .করে তার হাতের কাণের গলার গয়নাগুলো সব খুলে বেচুর হাতে দিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে বেচু তার মধ্যে গয়নাগুলো রেখে রুমালসুদ্ধ এগিয়ে দিল লোকটার দিকে, বিনীতভাবে বলল—দাদা, এগুলো নিয়ে এবার নেমে যান দয়া করে।

লোকটা নির্বিকার চিত্তে হাত বাড়াল গয়নার পু্টুলী নেবার জন্মে—ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাভাটরির দরজাটা খুলে প্রচণ্ড একটা লাফ মেরে দিবাকর এসে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। অতর্কিত আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। তার হাতের ছোরাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল কামরার মেঝের ওপর। ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল দুজনায়। গীতা ভয়ে কাঁদতে লাগল হাউ হাউ করে। বেচু তার চেরা বিকৃত স্বরে বলল—ও বাবা, এ গুণ্ডাটা বুঝি এতক্ষণ বাথরুমে ছেল রে গীতা!

সবল স্বাস্থ্য দিবাকরের সঙ্গে লোকটা কিন্তু বেশীক্ষণ এঁটে উঠতে পারল না। এক সময় বেজায় কাবু হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আর ঘুঁসোবেন না বাবু, এই নিন গয়নার পুঁটলী। এতে সব ক'খানাই আছে। সবে কাল জেল থেকে বেরিয়েছি—তাই···ও···ও···। লোকটা এলিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। দিবাকর এবার তাকাল গীতার দিকে।

বেচু বলে উঠল—দাদা, এমন চমৎকার চেহারা আপনার,—গুণ্ডাগিরি করেন কেন? অন্ত লাইনে গেলে-মানে স্টেজে কিম্বা ফিল্মে গেলে আপনাকে তো···

বাধা দিয়ে দিবাকর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আমি গুণ্ডা নই। ভদ্র লোকেরই ছেলে।

গীতা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল দিবাকরের দিকে। এবার তার কথা শুনে খানিকটা আত্মস্থ হল। বেচুও কম বিস্মিত হয়নি, বলল—এ্যাঁ বলেন কি?

দিবাকর গয়নার পুঁটলীটা গীতার হাতে দিয়ে বলে—এই নিন আপনার গয়না। দেখে নিন, কোন কিছু খোয়া গেছে কি না!

কাঁপা হাতে গয়নার পুঁটলীটা নিজের কাছে নিয়ে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে গীতা তাকাল দিবাকরের দিকে। মারামারি করে দিবাকরও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। গয়নার পুঁটলীটা গীতার হাতে দি' সে এসে বসল ওদিককার সীটে। সুটকেশটাকে তুলে রাখল বাঙ্কের ওপর। নিজের জায়গায় বসে হাঁফাচ্ছিল দিবাকর। বেচু এতক্ষণ হতবাক হয়ে দেখছিল দিবাকরকে। এবারে মুগ্ধ স্বরে বলল—সত্যি, আপনার কব্জির ইয়ে আছে মশায়! বাপ্‌স, এক এক ঠুসোয় ব্যাটা একেবারে—।

হঠাৎ মেঝের দিকে চেয়ে চমকে উঠে বলল,—এইরে মরে গেল নাকি?

লোকটা সত্যিই মরার মতই পড়ে আছে। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল তার দিবাকরের ঘুসির আঘাতে। এখন সেই রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। দিবাকর তাড়াতাড়ি ওঠে এল লোকটির কাছে। নাকের কাছে হাত দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভব করল। একটুকাল পরে বলল—মরেনি। অজ্ঞান হয়ে আছে!

বাথরুম থেকে রুমাল ভিজিয়ে জল এনে দিবাকর লোকটার চোখে মুখে ছিটোতে লাগল। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এল তার। বেচু দম ফেলে বলল,—বাঁচা গেল।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামতে দিবাকর যেয়ে পুলিশ ডেকে আনল। পুলিস এসে তার ডায়েরীতে প্রত্যেকের জবানবন্দী লিখে নিল। তারপর লোকটির হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে চলে গেল।

গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। গার্ড হুইসেলও দিল। দিবাকর তখনও গাড়ীর বাইরে রয়েছে দেখে গীতার কেমন যেন সন্দেহ হল। ও ভাবল দিবাকর হয়ত এ কামরায় উঠবে না আর। গাড়ী ছেড়ে দিতে সে আর নিজেকে সংবরণ রাখতে পারল না, হঠাৎ বলে ফেলল—আপনি এই কামরাতেই উঠুন না।

দিবাকর তাকাল গীতার দিকে। দেখল ওর চোখ দুটিতে শঙ্কার ছায়া তখনও থর্ থর্ করে কাঁপছে।

ওর কণ্ঠের অনুনয় ভরা সুরটুকু দিবাকরের ভাল লাগল। সে কামরায় উঠতে উঠতে হেসে বলল—আপনার ভয় এখনও কাটেনি বুঝি ?

সলজ্জ হেসে গীতা মুখ নামাল। ওর হয়ে বেচু জবাব দিল—ভয় কাটবে! আমার মত সাহসী লোকের পর্যন্ত এখনও বুক দুর্ দুর্ করছে আর ও তো মেয়েছেলে—স্রেফ্ যাকে বলে অবলা!

—বেচুদা। ফোঁস করে রেগে ওঠে গীতা—আর বাহাদুরী দেখিওনা। আমি অবলা, আর তুমি যে কত বড বীর পুরুষ তার পরিচয় তো পেলামই। তোমার বীরত্ব আমি ভাঙব—বাড়ী চল আগে। বাবাকে যদি না বলেছি তো··· ।

বেচু শঙ্কিত হয়, বলে—এইরে—! এ তুই কি বলছিস রে গীতু! তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্বন্ধ ? আমি না তোর দাদা ?

গীতা সরোষে বলল—চুপ কর! দাদা! বাড়ী পৌছই—তারপর বোঝাব তোমায়।

চোখ কপালে উঠল বেচুর। সে এবার অনুনয়ের সুরে বলল—গীতু,—যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কেন আর—মানে এক্সিডেণ্টালি ··ইয়ে মানে মামাবাবুকে তুই বুঝিয়ে, মানে···

গীতা চোখ পাকিয়ে বলল—যতই খাবি খাওনা কেন, বাবার কাছে তোমাকে আমি···উঃ! ভাবলে এখনও আমার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভাব তো, যদি ইনি না থাকতেন তাহ'লে কি হ'ত আজ ?

বেচু হাতজোড করে বলল—এই ঘাট মানছি, তোকে নিয়ে আর আমি কখন কোথাও যাব না।

গীতা রেগে বলল—এ আর তুমি বলবে কি ? আমি তোমার সঙ্গে কোথাও গেলে তো! চলনা বাড়ীতে!

দিবাকর দুই ভাই-বোনের কথা শুনে এতক্ষণ হাঁসছিল। গীতার সঙ্গে তার চোখোচুখি হতেই সে হেসে বলল—বেচারী যখন হাতজোর করে ঘাট মানছে তখন ওকে ক্ষমাই করে ফেলুন।

গীতা রেগেই বলল—আপনি জানেন না। ও বড একগুঁয়ে। কতবার বললাম, কাল সকালের ট্রেণে চল, তা কিছুতে শুনলে কি আমার কথা!

দিবাকর বলল—কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা ?

গীতা বলল—আমার পিসিমার বাড়ী। রায়গঞ্জে। এই বেচুদা আমার

পিসতুতো ভাই হয়। আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করে। ঐ নামেই পড়াশুনো করে, আসলে আড্ডা মারে, সিনেমা দেখে আর গ্লাস গ্লাস চা খায়, প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট ফোঁকে।

গীতার এ ধরনের কথায় বেচু দারুণ অপমানিত বোধ করল। চাপা গর্জনের স্বরে সে বলল—গীতা, বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছিস কিন্তু!

গীতা রোষকষায়িত নেত্রে বলল—চুপ কর!

দাঁতে দাঁত টিপে বেচু বলল—আচ্ছা ঠিক আছে! হাওড়ায় পৌঁছেই তারপর দেখবখন তোকে। মনে রাখিস, বাড. এখনো অনেক দূর। আমার সঙ্গেই যেতে হবে কিন্তু।

গীতার রাগ আরো বেড়ে গেল। সে মুখ বিকৃত করে বলল—বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে যেতে। আমি—আমাকে ইনিই বাড়ী পৌঁছে দিতে পারবেন।

কথাটা বলেই চমকে উঠল গীতা। লজ্জায় যেন মরে গেল। দিবাকরও কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। বেচু হতভম্ব হয়ে গেল গীতার কথা শুনে। এবারে ঠোঁট উল্টে বলল—'বেহায়া।' বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

গীতা এবারে আম্‌তা আম্‌তা করে বলল—হাওড়ায় পৌঁছতে পারলে আমি একাই যেতে পারব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

দিবাকর মৃদু হেসে প্রশ্ন করল—আপনাদের বাড়ী কোথায়?

গীতা বলল—দর্জিপাড়ায়। হাওড়ায় নেমে একটা ট্যাক্সী ভাড়া করে...

বেচু বলে উঠল—হ্যাঁ, ঐ ট্যাক্সী আর তোমাকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছবে না। সিধে নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে গুণ্ডাদের আড্ডায়। জাননাত' কি কাণ্ড চলছে আজকাল? যাওনা, ওঠ গিয়ে ট্যাক্সীতে!

বারেকের জন্য থম্‌কে গেল গীতা। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল,—হ্যাঁ, উঠবইত!

তারপর দিবাকরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা, আপনি থাকেন কোথায়?

দিবাকর উত্তর দিল,—শ্যামবাজারে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠে গীতা বলল,—তাহ'লে তো আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়েই যেতে হবে আপনাকে। আমাদের বাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে।

গীতার উজ্জ্বলতা দেখে বেচু চুব্‌সে গেল। তার দিকে বাঁকা চোখে

চেয়ে গীতা বলল,—শুনলেতো বেচুদা, ইনি আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়েই যাবেন। তারপর দিবাকরকে বলল,—আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?

দিবাকর কিন্তু কিন্তু করে বলল,—আমি…

আবার একবার আড়চোখে বেচুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল গীতা। দিবাকরকে বলল,—হ্যাঁ। চলুন না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে আমার বাবা খুব খুশী হবেন।

দিবাকর তাকাল বেচুর দিকে। বেচু চকিতে মুখ ঘোরাল। দিবাকর তখন গীতার দিকে চেয়ে অস্ফুটে বলল,—আপনার বাবা—

গীতা বলল,—হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে আলাপ করবেন আর সেই সঙ্গে বেচুদার বীরত্ব-কাহিনীর সাক্ষীও হবেন।

বেচুর শুক্‌নো চোয়াড়ে মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেল। গীতা. হাসতে হাসতে বলল,—বেশ মজা হবে। আমার মুখে সব শুনে আর আপনার সাক্ষী পেয়ে বেচুদাকে নিয়ে বাবা যা করবে না! বলেই জোরে হেসে উঠল গীতা। অপমানের জ্বালায় বেচু আর বসে থাকতে পারল না। উঠে পড়ল জায়গা ছেড়ে। গিয়ে দাঁড়াল ওদিকের জানালার ধারে।

গীতা আর দিবাকর হাসতে হাসতে সেদিকে চেয়ে দেখল। একসময় গীতা প্রশ্ন করল দিবাকরকে।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে?

দিবাকর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল,—কি বলুন।

গীতা বলল,—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

দিবাকর বলল,—ভুবনডাঙ্গা থেকে।

গীতা বলল,—বেডাতে গিয়েছিলেন বুঝি?

দিবাকর বলল, —ঠিক বেডাতে নয়—যা…। থমকে গেল দিবাকর। কি জবাব দেবে সে? চকিতে মনে পডল একদিনের ঘটনা।

এমনি একদিন যাত্রা করে ফিরছিল দিবাকর। বরাবরই সে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। সেদিনও এমনি একটি সুন্দরী তরুণী আর তার বাবা-মা ছিলেন কামরায়। তরুণীটির বাবা যেচে আলাপ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তরুণীর মা তাঁদের খাবার থেকে নিজ হাতে তাকে খাইয়েছিলেন। তারপর একথা সেকথার মাঝখানে যেমনি দিবাকর বলেছিল সে যাত্রাদলের হিরো, সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের সকলের চোখেই ঘৃণা ফুটে উঠেছিল। আলাপের সূত্রটা সেইখানেই

ছিন্ন করে দিয়েছিলেন তাঁরা। আজ সেকথা মনে হতেই দিবাকর বারেকের জন্য থমকে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম।

গীতা বলল,—ও। তারপরই চোখদুটিকে বড করে বলল,—ভাগ্যিস আপনি ফিরছিলেন এই গাডীতে,—নইলে যে কি সর্ব্বনাশ হত তা ভগবানই জানেন!

হেসে দিবাকর বলল,—ওটা আপনার নিছক বিনয়! জানেন তো, কথায় আছে,—রাখে হরি মারে কে!

গীতা তাকাল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দিবাকরের দিকে। দিবাকরের মুখে তখনও মিষ্টি হাসির রেশটুকু লেগেছিল। গীতা চোখ নামিয়ে নিল। মুখ নীচু করে শান্ত ধীর ভাবে বলল,—তাই হয়ত ভগবান ঠিক সময় আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাঁচাবার জন্যে।

হেসে দিবাকর বলল,—হ্যাঁ। ভগবান আমার কানে কানে বলে দিলেন, গুণ্ডার হাত থেকে ওঁদের বাঁচাও!

জোরে হেসে উঠল দিবাকর। গীতাও না হেসে পারলনা।

ওদের দিকে পিছনফিরে বেচু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল ওদের কথা আর রাগে ফুলছিল। ওদের জোরে হাসতে দেখে সে চকিতে ঘুরে তাকাল। গীতা দেখল তাকে। দিবাকরও দেখল। ওরা দু'জনেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে চুপ করে গেল।

পরিবেশটাকে সহজ করবার জন্যে দিবাকর নিজে থেকেই বেচুকে বলল,—দাদা, কি হ'ল আপনার? এসে বসুন!

বেচু আবার পিছন ফিরে দাঁড়াল কোন জবাব না দিয়ে।

দিবাকর গীতাকে বলল,—এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়। ওঁর পজিশনে পডলে রাগ হ'ত আমারও!

গীতা বিরক্ত স্বরে বলল,—আহা, রাগের মত কি বলেছি? যা সত্যি তা বলতে আমার বাধে না। করুকগে রাগ। ভারী বয়েই যাবে আমার।

দিবাকর প্রতিবাদ করে বলল,—নানা, সে কি কথা।

গীতা অন্য কথায় চলে গেল। প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, ট্রেনটা ঠিক ক'টার সময় হাওয়া পৌছবে?

দিবাকর বলল,- সাড়ে পাঁচটায়! তারপর হাতঘড়িটা দেখে বলল,—আর মাত্র আধঘণ্টা বাকী আছে।

বাইরের দিকে চেয়ে দেখে গীতা চোখ বড় বড় করে ভীত কণ্ঠে বলল,—ওরে বাবা, তাহলে তো অন্ধকার থাকবে তখন!

দিবাকর বলল,—তা একটু থাকবে।

গীতা চঞ্চল হয়ে উঠে বলল,—ঐ অন্ধকারের মধ্যে বেচুদার সঙ্গে ট্যাক্সীতে···। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে গীতা একবার তাকাল বেচুর দিকে। বেচু তখন জানালা দিয়ে তার মাথাটা বাইরে বার করে হাওয়া খাচ্ছে।

গীতা এবার দিবাকরের দিকে তাকিয়ে নীচুগলায় আবেদনের সুরে বলল,—সত্যি বলছি, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে এক ট্যাক্সীতে যান তাহলে খুব ভাল হয। বিশ্বাস করুন, বেচুদার সঙ্গে যেতে আমার আর একটুও ভরসা নেই।

ভ্রূ-দুটোকে তুলে একটু মৃদু হেসে দিবাকর বলল,—আমার সঙ্গে যেতেই বা এত ভরসা পাচ্ছেন কি করে?

গীতা বলল,—এরপরও যদি ভরসা না পাই তাহলে···যাবেন আমাদের সঙ্গে?

দিবাকর হেসে বলল,—আচ্ছা, তাই না হয় যাবো। আমার যাবার পথেই যখন আপনাদের বাড়ী পড়বে তখন···।

গীতা খুশী হয়ে বলল,—আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দোব!

তারপর বেচুর দিকে তাকিয়ে আদেশ মিশ্রিত কড়া সুরে বলল,—বেচুদা,—তখন থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বড়? এখানে এসে বসতে পারছ না?

বেচু রাগান্বিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল গীতার দিকে। বলল,—যা করছিস তাই কর। আমার জন্যে ভাবতে হবেনা। বলেই মুখখানা আবার ঘুরিয়ে নিল।

সাড়ে পাঁচটার সময় গাড়ী এসে পৌঁছল হাওড়ায়। তখনও চারিদিকে বেশ অন্ধকার রয়েছে। একটা ট্যাক্সী ডেকে তাতে উঠে বসল গীতা। তারপর দণ্ডায়মান দিবাকরকে ডাকল—আসুন।

দিবাকর কিন্তু কিন্তু করে শেষে উঠে বসল ট্যাক্সীতে। বেচু তখন হতভম্ব হয়ে গেছে। গীতা এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে ডাকল—বেচুদা ওঠ।

বেচু রাগে কাঁপছিল। বলল,—তুই যা। আমি যাব না এখন।

গীতা রেগে বলল,—উঠে এস শিগ্‌গীর। কতক্ষণ ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে রাখব?

রাগে ফেটে পড়ে বেচু বলল—উঠব না। তুই চলে যা। আর শুনে রাখ্‌, তোদের বাড়ীর ছায়া মাড়াব না আমি আর। বলেই সে হন্‌ হন্‌ করে চলতে লাগল।

দিবাকর অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বলল—না হয় নেবেই যাই। উনি হয়ত…

তাকে বাধা দিয়ে গীতা বলল—আপনি ন'মবেন কেন? আসলে ওটা ওর রাগ নয়। ওটা ওর ভয়। বাবাকে ভীষণ ভয় করে কিনা। আপনি কিছু ভাববেন না। বিকেলবেলা ও ঠিক ফিরে যাবে।

ট্যাক্সী ছুটে চলেছে হাওড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে। দু'ধারে নদীর দৃশ্য। ড্রাইভারের পাশে বসেছিল দিবাকর। আর গীতা পিছনের সিটে। দিবাকর তাকিয়ে দেখছিল নদীর দৃশ্য। আর গীতার দৃষ্টি ছিল উইণ্ডস্ক্রীণের ওপরে আঁটা ছোট্ট আয়নাটার ওপর। সেই আয়নায় প্রতিফলিত দিবাকরের প্রতিবিম্ব। মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল গীতা। চুরি করে দিবাকরের সুদর্শন মুখখানিকে যেন মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছিল সে।

হঠাৎ এক সময় চমকে উঠল গীতা। তার তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। দেখল দিবাকরের দৃষ্টি তার দৃষ্টির ওপরই এসে পড়েছে। চকিতে মুখটা নামিয়ে নিল গীতা। অপ্রস্তুত দিবাকরও মুখ ঘুরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

ট্যাক্সী তখন ব্রাজ পেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে এসে পড়ল। বাড়ীর দরজার সামনে আসতেই গীতা গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়ল হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে। আর মিষ্টি হেসে দিবাকরকে বলল,—এই আমাদের বাড়ী। আসুন! নেমে আসুন! বাড়ীর আর কেউ না উঠলেও বাবা ঠিক উঠে পড়েছেন। ঐ দেখুন না, বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখে দিবাকর নামতে একটু ইতস্তত করছে দেখে গীতা আবার বলল,—কি হল—নেমে পড়ুন! বাবার সঙ্গে আলাপ করবেন না?

আম্‌তা আম্‌তা করে দিবাকর বলল,—আর আলাপ করে লাভ কি? যার জন্যে আমাকে নিয়ে আসা সে তো আসেনি।

গীতা বলল,—ও নাইবা এল,—তাই বলে আপনি আসবেন না? অন্ততঃ এককাপ চা খেয়ে যান। আমি জানি, আপনার পরিচয় পেলে বাবা খুশীই হবেন।

এরপর আর বসে থাকা যায় না। দ্বিধাগ্রস্থ দিবাকর নামে ট্যাক্সী থেকে।

সামনে লন। লনের শেষে মস্তবড বাড়ী। গেট খুলে দেয় গীতা। স্বাগত জানিয়ে বলে,—আসুন। তারপর এগোয়।

দিবাকর তাকে অনুসরণ করে।

লনের ওপর দিয়ে ওরা দু'জনে নিঃশব্দে হেঁটে চলে। লাল শুরকি আর টুক্‌রো পাথরগুলো ওদের জুতোর তলায় পড়ে খস্‌খস্‌ আওয়াজ তোলে।

লন পেরিয়ে ওরা এসে ওঠে বাড়ীর দেউড়ীতে। সামনেই মস্ত একখানা ঘর। সাবেকী দামী আসবাব দিয়ে সাজান।

একখানা ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে সদ্য ঘুম থেকে উঠে পরম নিশ্চিন্তে গড়গড়া টানছিলেন যদুনাথ,—গীতার বাবা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। বিরাট ব্যক্তিত্ব। দিবাকর দরজায় গোড়ায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ওঁকে দেখে।

গীতা দ্রুত পদে এগিয়ে গেল বাবার কাছে। যদুনাথের দৃষ্টি পড়ল গীতার ওপর। উল্লসিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—আরে, মা তুই! আয়—আয়! যদুনাথ উঠে বসলেন সোজা হয়ে।

গীতা প্রণাম করল। যদুনাথ আশীর্ব্বাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাচা কোথায়?

গীতা বলল,—সে আসেনি বাবা।

যদুনাথ বিস্মিত হলেন,—আসেনি। সে কি! তাহলে তুই কার সঙ্গে এলি?

গীতা ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে যদুনাথও ফিরে তাকালেন। দেখলেন দরজার গোড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তিনি আবার তাকালেন মেয়ের দিকে। গীতা দিবাকরকে ডেকে বলল,—আসুন. ভিতরে আসুন! ইনিই আমার বাবা।

দিবাকর দ্বিধাগ্রস্তভাবেই হাতের স্যুটকেশটা দরজার পাশে রেখে পায়ে পায়ে এসে ঘরে ঢুকল। প্রণাম করল যদুনাথকে। গীতা বলল,—জান বাবা, এর সঙ্গে আমার কাল রাতে ট্রেণের মধ্যে আলাপ হয়েছে!

যদুনাথ বিস্মিত হয়েই তাকিয়েছিলেন দিবাকরের দিকে। অজান্তেই তাঁর কণ্ঠ হতে উদ্বেগ ফুটে বেরল—এঁ্যা— !

গীতা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল,—ইনি কাল আমাদের কামরায় না থাকলে তুমি আজ আর আমাকে খুঁজে পেতে না বাবা !

চমকে উঠলেন যদুনাথ। বিস্ময়ের চরমে উঠে বললেন,—তার মানে ?

গীতা বলল,—আমরা একটা ভয়ানক দুর্ঘটনাব মধ্যে পডেছিলাম বাবা। আর সেই দুর্ঘটনা থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন ইনি।

বিস্ময়ের চবমে উঠেই ছিলেন যদুনাথ। গীতা আর দিবাকরের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে দেখতে তিনি বললেন,—কি বলছিস তুই ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা মা…

গীতা দিবাকরকে বলল,—বসুন। তারপর যদুনাথের দিকে ফিরে বলল,—বাবা ওকে বসতে বল !

যদুনাথ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ বলব বৈকি ! বস বাবাজী—বস !

গীতাও বসল বাবার চেয়ারের হাতলটার ওপর। তারপর বলল,—বেচুদাকে কাল রাতে আমি শুধু পায়ে ধরতে বাকী রেখেছিলুম বাবা !

যদুনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—কেন—কেন, তুই ব্যাচার পায়ে ধরবি কেন ?

গীতা বলল,—বলছি শোন না। কাল রাতে বেচুদাকে অত করে বললাম, বেচুদা রাতের গাডীতে গিয়ে কাজ নেই—কাল বেলা দশটার ট্রেণেই যাব। তা কিছুতে শুনলো না। জেদ করে আমাকে নিয়ে এল। পিসিমা পিসেমশাই কত বারণ করেছিলেন কিন্তু কারও কথা শুনলো না।

আমাকে বলল, ওব আজকে নাকি কোন সিনেমায় টিকিট কাটা আছে। ষ্টেশনে এসেও আমি ওকে কত বোঝালাম, শেষে ফাঁকা কামরা দেখে বললাম, যেতেই যদি হয় তাহলে থার্ড ক্লাসে চল। তাও শুনল না। বডাই করে বলল, চোরগুণ্ডাকে ও নাকি ট্যাঁকে রাখতে পারে। এক রকম জোর করেই ও আমাকে একটা ফার্ষ্ট ক্লাসে তুলল। আর যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল।

—কি হল ?

সোজা হয়ে বসলেন যদুনাথ। গীতা চোখ বড বড করে বলল,—চলন্ত ট্রেনে উঠে পডল একটা গুণ্ডা।

রুদ্ধকণ্ঠে যদুনাথ বললেন,—তারপর ?

গীতা বলল,—গুণ্ডাটা কামরায় উঠেই একখানা বড় ছোরা বের করে আমার গয়নাগাটি সব খুলে দিতে বলল। আরও বলল, গয়নাগুলো পেলেই সে চলে যাবে! আমার তো তখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যদুনাথ বললেন,—আর ব্যাচা ?

হেসে কুটি কুটি হয়ে ভেঙ্গে পড়ল গীতা। বলল,—তার কথা আর বলনা বাবা। সে বীরপুরুষ তখন ভয়ে কাঠ হয়ে কাপ্‌ছে। আমি কি করব, গয়নাগুলো এক এক করে খুলে দিয়ে দিলাম গুণ্ডার হাতে। ঠিক সেই সময় ইনি বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গুণ্ডাটার ওপর। ওঃ! তারপর সে কি মারামারি আর ধ্বস্তাধ্বস্তি। গুণ্ডার হাতের চক্‌চকে ছুরিটা মাটিতে ছিট্‌কে পডল এঁর হাতের ধাক্কায়। তারপর আর কয়েকটা ঘুষিতেই অজ্ঞান করে দিলেন তাকে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে দিবাকরের দিকে চেয়ে যদুনাথ বললেন,—তারপর ?

গীতা বলল,—তারপর, পরের ষ্টেসনে পুলিসের হাতে গুণ্ডাটাকে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন আমাদের কামরায়। ঐ দেখ না ভদ্রলোকের কপালে কি রকম কালসিটে পড়ে গেছে গুণ্ডাটার সাথে মারপিট করে।

যদুনাথ সবিস্ময়ে উত্তেজিতকণ্ঠে বললেন,—তোর গয়নাগুলো ?

হেসে গীতা তার সারা অঙ্গ মেলে ধরে বলল,—একটাও খোয়া যায়নি বাবা। সব আছে।

উত্তেজিত যদুনাথ বললেন,—ব্যাচা গেল কোথায় ?

গীতা বলল,—তার কথা আর বলোনা। যেই দেখেছে যে ভদ্রলোককে গাড়ীতে তুলেছি আমি, বাড়ী নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব বলে, অমনি সে কাজের ছুতো দেখিয়ে পালাল। আসলে তোমার ভয়ে ও পালিয়েছে।

শুনে রাগে ফেটে পডলেন যদুনাথ। বেচুকে সামনে পেলে হয়ত খুনই করে বসতেন তিনি। কড় হুকুম দিলেন চাকরদের ডেকে। বললেন, বেচু এলেই—যেন তাকে সেই মুহূর্ত্তে তার মালপত্তর সমেত দুর করে দেওয়া হয়।

শুনে অপ্রতিভ হলো দিবাকর। যদুনাথ বললেন,—একটা অপদার্থ, বুঝলে বাবাজী! একনম্বরের স্কাউণ্ড্রেল! আশ্চর্য! আজকালকার ছোঁড়া-

গুলোর মুরোদ শুধু মুখেই! দেখতো, যদি তুমি না থাকতে ঐ কামরায়, তাহলে কি কেলেঙ্কারী হয়ে যেত! কি করে ঐ চা-খেকো হাড়গিলেটা মেয়েটাকে বাঁচাত! উঃ, ভাবতেই আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এমনি সময়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন গীতার মা ভারতীদেবী। তাঁর পরণে শুভ্র একখানি গরদ। চওড়া লাল টুকটুকে পাড় তার। সদ্যস্নাতা মহিলাটির দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়েছিল দিবাকর। গীতা বলল,—ইনি আমার মা।

দিবাকর উঠে প্রণাম করল। ভারতীদেবী আশীর্ব্বাদ করলেন। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দেখে হুঙ্কার ছেড়ে যদুনাথ বললেন,—শোন, আমার গুণধর ভাগ্নেটির কাণ্ড!

বিস্মিত ভারতীদেবী বললেন,—কি হয়েছে?

যদুনাথ বললেন,—আর কি হবে। শোন তোমার মেয়ের কাছে। তারপর দিবাকরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন,—ঘরে ঘরে যুবকদের তোমার মত সাহসী হওয়া উচিত। তবেতো জাতটা বাঁচবে। নইলে ঐ ব্যাচার মত হাড়গিলের সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তাহলে শুধু বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়াতেই উচ্ছন্ন যাবে দেশটা।

ভারতীদেবী বসলেন একটা সোফায়। প্রশ্ন করলেন,—এই ছেলেটি কে?

যদুনাথ বললেন,—ও হল সত্যিকারের একজন বাঙ্গালী। প্রতাপাদিত্য, সূর্যকান্ত, শঙ্করের মত···।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিরক্তকণ্ঠে ভারতী দেবী বললেন,—তুমি থামতো বাপু! সক্কালবেলা লেকচার শুরু করলে!

চোখ দুটো বড় করে যদুনাথ বললেন,—লেকচার! লেক্চার বলছ কি গীতার মা? তুমি বাবাজীর পরিচয় পেলেই বুঝতে পারবে আমি মিথ্যেই লেক্চার দিচ্ছি না।

কৃত্রিম রাগের সুরে ভারতীদেবী বললেন,—সেই কথাইতো জিজ্ঞাসা করছি তখন থেকে।—ছেলেটি কে রে গীতা? তিনি স্বামীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে। গীতা হাসছিল। বলল,—বাবার মুখ থেকেই শোন মা! ভারতীদেবী আবার যদুনাথের দিকে মুখ ফেরালেন।

যদুনাথ দিবাকরের দিকে চেয়ে গর্ব্বের সুরে বললেন,—এই ছেলেটি তোমার মেয়েকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছে!

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ভারতী বললেন,—গুণ্ডা—সে কি!

যদুনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—আর কি,—মেয়ে তো গেছিল আর একটু হোলে! ধনে প্রাণে মরতে বসেছিল ঐ বকাটে বজ্জাত ব্যাচার জন্যে। ছি ছি ছিঃ! ওকে আমার ভাগ্নে বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা হচ্ছে। আমি যদুনাথ দত্ত, বাঘে-গরুকে চিরকাল একঘাটে জল খাইয়ে এসেছি। যার দাপটে সারা তালুকের প্রজারা ভয়ে ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপত,—তার ভাগ্নে কিনা এমন অপদার্থ! দিবাকরের দিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরের সঙ্গে বললেন,—হ্যাঁ বাবাজী, খ্যাতিই বল আর অখ্যাতিই বল, চিরকাল ডাকসাইটে জমিদার বলে আমাকে লোকে যমের মত ভয় করেই চলে।

ভারতী দেবীর ধৈর্য আর রইল না। তিনি একান্তই অধৈর্য হয়ে বললেন,—কি বিপদ! কি হয়েছিল সেইটাই বলনা।

যদুনাথ বললেন সব কথা। শুনে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ভারতী দেবী তাকালেন দিবাকরের দিকে। আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন,—বেচে থাক বাবা—সুখে থাক! তারপরই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—ওরে গদাই, চা দে এখানে। দিবাকরের দিকে ফিরে আবার বললেন,—বস বাবা, আমি শাড়ীটা পাল্টে আসি। প্রসাদ দোব তোমাকে।

তিনি চলে যেতেই যদুনাথ এবার দিবাকরের অন্য পরিচয় সংগ্রহে উন্মুখ হলেন। প্রশ্ন করলেন,—কি নাম তোমার বাবাজী?

বিনয়ের সুরে দিবাকর বলল,—দিবাকর রায়।

—কি কর তুমি? যদুনাথ প্রশ্ন করলেন।

থম্‌কে গেল দিবাকর। এ প্রশ্নের জবাব যে তাকে দিতে হবে সেটা সে তখনই জানত যখন গীতার অনুরোধে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে সে গাড়ী থেকে নেমেছিল। একটা উত্তর সে মনে মনে তৈরী করেই রেখেছিল। তার এক বন্ধু ঠিকাদারী কাজ করে। মাঝে মাঝে সেও তার বন্ধুর সঙ্গে ঠিকাদারী কাজ দেখতে এদিক ওদিক যেত। তাই সে ঠিক করেছিল বলবে—সে ঠিকাদারী করে! কিন্তু যদুনাথের প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর দিতে পারল না। মিথ্যা জবাবটা জিভেরডগায় এসেও কেমন যেন আটকে গেল। যদুনাথ তার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন দেখে আবার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিল,—আজ্ঞে আমি ঠিকাদারী করি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল যদুনাথের দু'চোখ—ঠিকাদার, মানে কনট্রাক্টর তুমি কনট্রাক্টরী কর ?

বিনীত ভাবেই দিবাকর বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ দশ বছর এই কাজই করছি।

স-প্রশংস দৃষ্টিতে দিবাকরের দিকে চেয়ে যদুনাথ বললেন,—এ্যাঁ! বল কি —দশবছর ? তাহলে তো তুমি 'এ' ক্লাস কনট্রাক্টর হে!

দিবাকর সলজ্জে হেসে মুখ নামাল। যদুনাথ এবার তার অন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। দিবাকর সমানে মিথ্যার জ'লই বুনে যেতে লাগল।

যদুনাথ প্রশ্ন করলেন, --তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ বাবাজী ?

বিনীত ভাবে হেসে দিবাকর বলল,—আজ্ঞে তা বিদ্যাসাগর না হলেও জানি কিছু।

ওর এই সুন্দর জবাবে যদুনাথ মুগ্ধ হলেন। তিনি বুঝলেন, দিবাকর সত্যিই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। আবার প্রশ্ন করলেন,—তোমার বাড়ী—মা-বাবা···

দিবাকর বলল,—আজ্ঞে শ্যামবাজারের বাড়ীটা আমার নিজেরই। আর বাবা—মা। একটু থেমে থেকে সে দুঃখ প্রকাশ করে বলল,—ছেলেবেলায় মা বাপকে হারিয়ে ফেলেছি। মানুষ হয়েছিলাম এক কাকার কাছে। এখন তিনিও বেঁচে নেই। একাই থাকি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনা।

যদুনাথ মনে মনে খুশীতে উপ্‌চে পড়লেন। চাকর চা-জল খাবার দিয়ে গেল। একটু পরে ভারতী দেবীও এলেন একটা সাদা পাথরের রেকাবে করে কিছু ফল আর মিষ্টি নিয়ে। আদর করে বললেন,—একটু প্রসাদ খাও বাবা!

দিবাকর প্রসাদের রেকাবিটা ভারতী দেবীর হাত থেকে নিয়ে ভক্তিভরে কপালে ঠেকাল। তা দেখে সুস্মিত দৃষ্টিতে ভারতী দেবী তাকালেন যদুনাথের দিকে। দেখলেন যদুনাথের দৃষ্টিতেও সুস্পষ্ট প্রসন্নতা ভাসছে।

দিবাকর কিছু জলখাবার আর প্রসাদ খেয়ে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতেই যদুনাথ বললেন,—একি বাবাজী, সবই যে পড়ে রইল। খাও—!

দিবাকর কাতরভাবে বলল,—আজ্ঞে মাফ করবেন। আর পারব না সারা রাত ট্রেনে জেগে আর······।

যদুনাথ বললেন,—আচ্ছা। কিন্তু কথা দাও, সময়মত আর একদিন এসে ভাল করে খেয়ে যাবে?

দিবাকর ইতস্তত করতে লাগল।

দিবাকর জবাব দিচ্ছে না দেখে যদুনাথ আবার বললেন,—রাজী না হলে কিন্তু আমি ছাড়ব না তোমাকে। মনে রেখ জমিদারী গেলেও যদুনাথের দেহে এখনও জমিদারের রক্ত রয়েছে। ও যতই তুমি গুণ্ডা ঠেঙাও না কেন,—এই যদুনাথের কব্জির কাছে এখনও শিশু! বলেই তিনি তাঁর পেশীবহুল শক্ত হাতের মুঠো তুলে দেখালেন। খিল খিল করে হাসল গীতা। দিবাকরও মুখ টিপে হাসল। যদুনাথ বললেন,—পরশু রোববার আছে। ঐদিনই তুমি আসবে। আমার সঙ্গে বসে খাবে। কেমন, রাজী?

হেসে দিবাকর বলল,—আচ্ছা, তাই না হয় হবে।

খুশী হয়ে যদুনাথ বললেন,—এই তো চাই! তারপর আবেগভরে বললেন,—বাবাজা, তুমি আমার মেয়েকে বিপদের হাত থেকে রক্ষে করেছ, তুমি আমাদের পরিবারের যে কত বড বন্ধু হয়ে গেছ সে কথা তোমাকে মুখে বলে বোঝাতে পারব না।

দিবাকর মুখ তুলতেই চোখাচুখি হল গীতার সঙ্গে। দেখল, গীতার দৃষ্টিতেও আত্মসমর্পণের চাহনি।

বুকের মধ্যেটায় শিরশির করে উঠল দিবাকরের।

ভারতী দেবী বললেন,—তোমার ঋণ জীবনে শোধ করবার নয় বাবা।

সেদিনের মত দিবাকর—বিদায় নিল। যাবার সময় আবার অঙ্গীকার করে গেল পরশু দিন সে নিশ্চয়ই আসবে।

পথে বেরিয়ে দিবাকর যেন অগাধ সমুদ্রে পড়ল। ভেবেছিল একদিনের সত্যি পরিচয় মিথ্যে দিয়ে ঢেকে কোনরকমে পালিয়ে আসবে। কিন্তু এ যে আরেকদিনও আসতে হবে তাকে!

দিবাকর মনকে দৃঢ় করে, না আর সে আসবে না। মিথ্যার বিনিময়ে এভাবে একটা অভিজাত ঘরের সম্মানের আসনে সে বসতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গীতার মিষ্টি মুখখানি। তার সেই আত্মসমর্পণের দৃষ্টির ছবি। মনটা তার স্বপ্ন-রঙ্গীন হয়ে উঠল। আপন মনে ভাবতে ভাবতে পথ চলতে থাকে দিবাকর।

সেদিন রাত্রে ভারতী দেবী যতুনাথের শোবার ঘরে স্বামীকে তুধ খাওয়াতে এসে নিজ থেকেই দিবাকরের প্রসঙ্গ তুললেন। গড়গড়া টানতে টানতে যতুনাথও তখন ভাবছিলেন দিবাকরের কথা। ভারতীদেবী বললেন,—
—বেশ ছেলে দিবাকর! যেমন কার্ত্তিকের মত চেহারা তেমনি ভদ্র ব্যবহার। দেখলে জামাই করতে লোভ হয়।

স্ত্রী-র কথায় মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন যতুনাথ। মৃত্ব হেসে বললেন,— তাই নাকি? তা যদি তোমার লোভই হয়ে থাকে ওর ওপর, আমি নয় ওকে তোমার জামাই করেই দিচ্ছি।

শুনে খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠলেন ভারতী। বললেন,—সত্যি!

যতুনাথ গড়গড়া টানতে টানতে সায় দিলেন। তারপর বললেন, —ছেলেটিকে আমারও ভারী পছন্দ হয়েছে গীতার মা। শিক্ষায়, রুচিতে আর চেহারায় দিবাকর একশ'র মধ্যে একশ নম্বর পাবার মতই ছেলে। তারও পর সবচেয়ে লোভনীয় যেটা, তা হল ওর বাপ-মা বা আত্মীয়-স্বজন না থাকা। আমাদের ঐ একটি মাত্র মেয়ে। শেষে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে কোন্ শাশুড়ীর নির্য্যাতনের ফেরে পড়বে এই একটা মস্ত চিন্তা আমার মাথায় সব সময় ঘোরাফেরা করে। দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে দিলে আমার সে চিন্তা দূর হবে। কারণ, মেয়ের বিয়ে দিলেও সে পর হবে না।

ভারতী আদর জড়ানো কণ্ঠে বললেন,—তবে আর দেরী করো না গো,— যত শিগগির পার শুভকাজটা শেষ করে ফেল। গীতার কথায় বার্ত্তায় বুঝেছি, দিবাকরকে ওরও মনে ধরেছে!

পাশের ঘরে কান খাড়া করে গীতা এতক্ষণ শুনছিল বাবা আর মায়ের কথা। মায়ের কথা শুনে খুশীতে নেচে উঠল সে। শুনল, মায়ের কথার উত্তরে বাবা বললেন, 'মনে ধরবে না মানে? ওর মত বীরপুরুষকে কোন্ মেয়ে না ভালবাসবে? জান না বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

শুনে খুশীতে লুটিয়ে পড়ল গীতা বিছানার ওপর। জানালার দিকে চেয়ে দেখল পরদাগুলোয় হাওয়া লেগে ফুলে ফুলে উঠছে। গীতা অনুভব করল, তার মনের মধ্যেও আনন্দের ঢেউ যেন ফুলে ফুলে উঠছে। চোখ তুটি তার স্বপ্ন-রঙীন হয়ে উঠল। আর চোখের সামনে ভেসে উঠল দিবাকরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি।

দিবাকরের মনের অবস্থাও গীতার মতই। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে সে একমনে রঙ্গীন স্বপ্নের বেনারসী বুনে চলেছে। মিষ্টি গীতা, চপলা গীতা, তার লাস্যময়ী গীতা, অষ্টাদশ বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে দীপ্ত যৌবনা শিশির বিন্দুর মত টলটল করছে। তার কাজলকালো ডাগর চোখ দুটি, তার মুক্তো-ঝরা মিষ্টি হাসির ছবি দিবাকরের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ; আর সেই ছবির দিকে তাকিয়ে একেবারে ভাবে ডুবে আছে সে।

চাকর গণেশ এক কাপ দুধ নিয়ে এল। ডাকল,—দাদাবাবু—দাদাবাবু—

কোন হুঁসই নেই দিবাকরের। গণেশ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল, দিবাকর জেগেই ত' রয়েছে। তখন সে রসিকতা করার জন্য বলল,—বলি,—আসর ছেড়ে বাড়াতেও অভিনয় শুরু করলে নাকি গো দাদাবাবু ?

চমকে উঠল দিবাকর এ কথা শুনে। রেগে বলল,—কি বললি ? অভিনয় ?

গণেশ বুঝতে পারল না এতে রাগের কারণটা ঘটল কখন। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বিছানায় উঠে বসে দিবাকর তাকে ধমকের সুরেই বললে,—খবরদার আসরের নাম আমার সামনে আর কোনদিন উচ্চারণ করবি না—যা !

গণেশ হতভম্বের মতই চলে গেল। সে চলে যাবার পর কি যেন ভাবতে লাগল দিবাকর। ভাবতে ভাবতে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিছানা ছেড়ে নেমে অস্থিরপদে পায়চারী করতে লাগল।

সেদিন রবিবার।

ভারতী দেবী বললেন যদুনাথকে,—আজই তো দিবাকরের আসবার কথা আছে না ?

যদুনাথ বললেন,—হ্যাঁ। সকাল সকালই তো তাকে আসতে বলেছি।

ভারতী বললেন,—আজই পাড়বে নাকি কথাটা ?

মুখব্যাদান করে যদুনাথ বললেন,—তোমার যেমন কাণ্ড! আমার মত দুঁদে জমিদারের গিন্নী হয়ে তোমার বুদ্ধি যে কি করে এত ভোঁতা হতে পারে এটা আমার…

বিরক্ত হয়ে ভারতী বললেন,—ওঃ, আবার শুরু হল লেক্‌চার! বলি, কি বলতে চাও বল তো দেখি ? এলেবেলে শুনতে চাইনা আমি!

গড়গড়ায় বার কয়েক সুখ টান মেরে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে যদুনাথ বললেন,—হুঁ—হুঁ, পথে এস!—বলছিলাম, আজই দিবাকরকে ওকথা বলা যায় কখন? বলব,—সময় হলেই বলব। আগে দাঁড়াও আরও একটু নেড়ে চেড়ে দেখি। আরও ক'বার বাজাই তবে তো! নইলে ভাল লাগল বলেই অমনি আমার একমাত্র মেয়েটাকে······

হঠাৎ খোলা দরজার দিকে চেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বললেন,—আরে, ঐ তো দিবাকর আসছে।

ভারতীও তাকালেন বাইরের দিকে। দেখলেন, দিবাকর আসছে।

দিবাকর এল। ওঁদের প্রণাম করল। যদুনাথ বললেন,—বোস বাবাজী—বস।

দিবাকর বসল একটা চেয়ারে।

গীতাও আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিজের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। দিবাকর তার মনকে ছুঁয়েছে। দিবাকর এসেছে খবর পাবার পর থেকেই সে যে কি করবে ঠিক করতে পারছেনা। একবার একটা শাড়ী পড়ছে, আয়নায় দেখছে, পরক্ষণেই সে শাড়ী বদলে আরেকখানা পরছে। কিছুতেই আর মন স্থির করতে পারছেনা।

এমন সময় ভারতী এসে ঢুকলেন তার ঘরে। বললেন,—ওরে গীতা, তুই একবার রান্নাঘরে যা না মা। ঠাকুরকে বলে আয় মাংসে যেন খুব বেশী ঝাল না দেয়। দিবাকর ঝাল সহ্য করতে পারেনা।

গীতা মনে মনে হাসল। বলল,—আমি এখুনি বলে আসছি মা। বলেই সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর দিবাকর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিল। যদুনাথ খাওয়ার পর কি রাতে কি দুপুরে আর এক মিনিটও বসতে পারেন না। ঘুমে শরীর পাথর হয়ে আসে। সুতরাং তিনি তাঁর ঘরেই ঘুমোচ্ছেন। গীতা জানে বাবা বেলা চারটের আগে ঘুম থেকে উঠবে না। আর মা? তাঁর খাওয়া শেষ হতে এখনও আধঘণ্টা তো বটেই।

এই সুযোগে গীতা এসে ঢুকল দিবাকরের ঘরে। অছিলা করে বলল,—শুনলাম পান আপনি খান না? উঠে বসল দিবাকর। হেসে বলল,—হ্যাঁ। পান খেলে আমার কেমন যেন গা বমি বমি করে।

গীতা হেসে বলল,—তাই নাকি? তাহলে এলাচ কিম্বা লবঙ্গ?

দিবাকর বলল,—হ্যাঁ, ওগুলো খাই একটু আধটু। বাইরে কোথাও ক্ষেপ মারতে···সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেল দিবাকর। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,—বাইরে যখন মাঠে ঘাটে কাজ করতে হয়—মানে কুলিদের সঙ্গে অনর্গল বকতে হয় তখন ওই এলাচ বা লবঙ্গ আমার খুব উপকারে লাগে।

হাতের মুঠো খুলে কয়েকটা এলাচ আর লবঙ্গ নিয়ে দিবাকরের হাতে দিতে দিতে হেসে গীতা বলল, —আজও উপকারেই লাগবে। নিন ধরুন!

হাত পেতে সেগুলো নিয়ে দিবাকর বিনয় প্রকাশ করে বলল,—ধন্যবাদ।

গীতা হাসল মিষ্টি করে। তারপর বলল,—আমার মা-বাবাকে কেমন লাগল?

দিবাকর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,—তুলনা হয়না। এমন অমায়িক ভদ্র ধনী আমি আর একটিও দেখিনি।

তির্যক দৃষ্টি হেনে গীতা বলল,—সত্যি বলছেন না মিথ্যে বিনয় প্রকাশ করছেন?

দিবাকর বলল,—বিশ্বাস করুন—একটুও বাড়িয়ে বলছিনা।

গীতা বলল,—আর আমাদের বাড়ী-ঘর?

দিবাকর বলল,—রাজবাড়ী বললে অত্যুক্তি হয় না। পরে বলল,—বড় জমিদারের বাড়ীর অতিথি আমি জীবনে বহুবার হয়েছি গীতা দেবী কিন্তু এমন আপ্যায়ন বোধহয় জীবনে এই প্রথম পেলাম।

গীতা এসে বসল একটা চেয়ারে, একেবারে দিবাকরের সামনে। বলল,—জানেন, বেচুদাকে বাবা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দিবাকর বলল,— তাই নাকি!

গীতা বলল,--হ্যা। কাল এসেছিল বেচুদা। বাবা খুব বকেছিল। শেষে বলল,—তোমাকে মানুষ করতে পারব না—তুমি গাধা হয়ে সেই গাঁয়ে গিয়েই থাকগে।

বেচুদা তক্ষুণি তার জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেল। যে খাটে আজ আপনি বসে আছেন সেই খাটে এতদিন বেচুদা শুত।

অপ্রস্তুতের স্বরে দিবাকর বলল,—বেচারার এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই কিন্তু দায়ী।

গীতা বলে উঠল,—তা কেন? বেচুদার দুর্ঘটনার জন্যে বেচুদা নিজেই দায়ী। একটা গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে···বেশ হয়েছে! একটু পরে চোখে ভীত দৃষ্টি ফুটিয়ে বলল,—উঃ সে রাত্রের কথা মনে হলে বুকটা এখনও আমার ধুক্ ধুক্ করে। বাপ্‌রে—কি ভীষণ লোকটার চেহারা! তারপর দিবাকরকে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা ওর মত অমন শক্ত সমর্থ লোকটাকে আপনি আপনার এমন নরম হাতের ঘুঁসিতে কি করে কাবু করলেন বলুনতো? আপনি কি যাদুমন্ত্র-টন্ত্র জানেন নাকি?

হাসল দিবাকর। বলল,—যাদুমন্ত্র! না। হাত আমার নরম হলেও ঘুঁসি নরম নয় গীতা দেবী। প্রমাণ দোব? বলেই দিবাকর উঠে পড়ল খাট ছেড়ে। তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে সজোরে মারল একটা প্রচণ্ড ঘুসি।

সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে ছুটে এল গীতা। হিতাহিত ভুলে ক্ষিপ্র হস্তে সে চেপে ধরল দিবাকরের ঘুসিমারা হাতখানা। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে হাতের মুঠোটা ছড়িয়ে খুঁজতে লাগল কোথাও ছড়ে ফেটে গেছে কিনা।

তার ব্যকুলতা দেখে হাসতে হাসতে দিবাকর বলল,—না না, ওতে কিছু হয়না আমার। ছেলেবেলায় বছরের পর বছর ঘুসি প্র্যাকটিস করে হাতটা শক্ত ইট হয়ে আছে।

আস্তে আস্তে গীতার হাতের মধ্য থেকে নিজের হাতখানা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল দিবাকর। গীতা ছেড়ে দিল। হতবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দিবাকরের দিকে। পরক্ষণেই একরাশ লজ্জা এসে তাকে চঞ্চল করে তুলল। সে ছুটে ঘর থেকে পালাতে গেল। বাধা দিল দিবাকর। চাপা আবেগের স্বরে ডাকল,—গীতাদেবী—

থমকে দাঁড়াল গীতা। তারপর রক্তিম মুখে ফিরে তাকাল দিবাকরের দিকে।

কাছে এসে দিবাকর বলল,—আমি আজ যাই?

চকিতে কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল গীতার মধ্যে। সে একটু ইতস্তত করে বলল,—অ্যা—আমি কি করে তা বলব। আপনি বাবার অতিথি। বাবাকে না বলে···

মৃদু হেসে দিবাকর বলল,—শুনেছি তাঁর ঘুম নাকি চারটের আগে ভাঙ্গে না। ততক্ষণ পর্যন্ত···

হঠাৎ যেন রেগে গেল গীতা। কঠিন সুরে বলল,—কেন, আমাদের বাড়ীটা বুঝি ভাল লাগছে না? ভাল না লাগলে চলে যান। আমরা কাউকে জোর করে ধরে রাখিনা। বলেই গীতা এগোচ্ছিল। তাকে আবার ডাকল দিবাকর,—গীতা দেবী—।

আবার থামল গীতা। দিবাকর তার আরও কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল,—আপনি রাগ করলেন গীতা দেবী?

ম্লান হেসে গীতা বলল,—রাগ! সে অধিকার তো আমার নেই দিবাকর বাবু। তাছাড়া আমি রাগ করলেই বা আপনার কি আসে যায়? আপনি আমাকে মহা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতা আমি আজীবন প্রকাশ করে যাব। গীতার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল। চোখের কোণ দুটো চিক্ চিক্ করতে লাগল জলে।

সেদিকে তাকিয়ে দিবাকর ব্যথা ভরা কণ্ঠে বলল,—একি, এটুকুতে জল এসে গেল আপনার চোখে?

তাড়াতাড়ি চোখের কোণ দুটো মুছে গীতা বলল,—কই না ত'।—কাঁদব কেন?

গীতা সলজ্জে এগোল আবার। হঠাৎ দিবাকরের অজান্তেই তার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে বেরিয়ে এল ছোট্ট মিষ্টি একটি ডাক,—'গী—তা—'

দরজায় গোড়ায় গীতার পা দু'খানা আটকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল গীতা। চোখাচুখি হল দিবাকরের সঙ্গে। দিবাকরের দু'চোখের তারায় কিসের যেন ছায়া দেখল গীতা।

এগিয়ে এল দিবাকর। দু'জনেই নির্ব্বাক। ভাষা যেন হারিয়ে গেছে ওদের কণ্ঠ থেকে। শুধু নীরবে স্বপ্নালুদৃষ্টিতে চেয়েই থাকে পরস্পর পরস্পরের দিকে।

হঠাৎ মোহ ভাঙ্গে গীতার। স্বপ্নটাও বুঝি এলোমেলো হয়ে যায়। সলজ্জে বলে,—আমি যাই—।

আবেগ ভরা কণ্ঠে দিবাকর অস্ফুটে বলে ওঠে,—আমিও যাই—!

দিবাকরের দিকে স্বপ্নরঙ্গীণ চোখ দুটো তুলে গীতা তাকায়। তারপর কয়েক মুহূর্ত্তের নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ফেলে একসময়,—আবার এস—বলেই ছুটে চলে যায় ঘর থেকে।

দিবাকরের মনে হয় তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে। চঞ্চল

হয়ে ওঠে দিবাকর। মনের মধ্যে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ তোলপাড় করে গীতার শেষের ছোট্ট কথাটিকে ঘিরে—'আবার এস।' বার বার প্রশ্ন ওঠে দিবাকরের মনে, 'তবে কি…'

এ প্রশ্নের সমাধান করল গীতাই। একদিন সে নিজেই ধরা দিল দিবাকরকে দু' বাহু বাড়িয়ে। দিবাকর আহ্বান করল গীতাকে।

ওদের ভালবাসা নিরঙ্কুশ ভাবে এগিয়ে চলল। হাসি গানে দিবাকরের জীবনটা সুখ-স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল।

সে ভুলে গেল তার আর গীতার মধ্যে বিরাট পার্থক্যের কথা। ভুলে গেল সামাজিক জীবনে তাদের বিশাল ব্যবধানের কথা। গীতা তাকে নিয়ে এসেছে এক নোতুন রাজ্যে। যেখানে আলো আছে আর আছে মুক্ত বাতাস। দিবাকর ভুলে গেলো অতীতকে—বর্তমানের স্বপ্নে সে মশগুল হয়ে রইল। আজ বোটানিক্সের নির্জন তরুছায়ার পরিবেশ, কাল কোন নিরালা রেঁস্তোরার আলো-আঁধারীর মাঝে, কিম্বা কোন নদীর কিনারায় বালুতটে। চলে ছোটাছুটি। দিন কাটে আনন্দে। দিবাকর ভাবে—'এইতো জীবন'!

কিছুদিন পরের কথা। যদুনাথ আর ভারতী দেবী এবার তৎপর হয়ে উঠলেন। ভারতী দেবী বললেন—আর দেরী করো না বাপু! এবার ওদের দু'হাত এক করবার ব্যবস্থা কর।

যদুনাথ চুরুটে টান দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—হুঁ। আমিও সেই কথাই ভাবছি! দিবাকরকে যাচাই করা আমার হয়ে গেছে। ছেলেটা খাঁটি সোনাই বটে!

সেদিন চায়ের টেবিলে যদুনাথ নিজেই কথাটা উত্থাপন করলেন। চায়ের কাপে চুমুক মেরে তিনি চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে দিবাকরকে বললেন—দিবাকর, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

দিবাকর চায়ের কাপটা রাখতে রাখতে বিনীত ভাবে বলল—আজ্ঞে বলুন! তারপরেই সে লক্ষ্য করল গীতা উঠে চলে যাচ্ছে সেখান থেকে। সে একটু অবাক হল!

যদুনাথ বললেন—আমাদের বড় ইচ্ছে গীতাকে তোমার হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিত হই।

দিবাকর থমকে গেল। মাথা নীচু করে স্থির হয়ে রইল।

যদুনাথ বললেন—গীতা আমাদের একটি মাত্র সন্তান। আমাদের বুকের রক্ত। ওকে তো আর যার তার হাতে দিতে পারিনা। অনেক ভেবেচিন্তে আমরা দু'জনেই একমত হয়েছি যে গীতার ভার নেবার উপযুক্ততা তোমারই আছে। এখন তোমার কি বলার আছে—বল ?

চট্ করে দিবাকর কোন জবাব দিল না দেখে ওদিককার দেওয়ালের কোণে লুকিয়ে থাকা গীতা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। সে দেওয়ালের আড়াল থেকে সন্তর্পণে মুখ বার করে দেখল, দিবাকরের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে ভাবল, হয়ত দায়ীত্বের কথা ভেবেই দিবাকর ভয় পেয়ে গেছে। বিবাহ তো আর গোপন ভালোবাসার মধুক্ষরা মুহূর্তের মালা-গাঁথা নয়—বিরাট বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে হবে। তাই বোধহয়, দিবাকর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

যদুনাথও লক্ষ্য করলেন, পরে সস্নেহে কোমলকণ্ঠে বললেন,—না না, তাড়া নেই কিছু। তুমি ভেবে দেখ, কাল হোক, পরশু হোক—যখন হয় তুমি ভেবে আমাকে জানিও। আর হ্যাঁ, গীতা বলছিল একদিন তোমার বাড়ীতে বেড়াতে যাবার কথা।

দিবাকরের হৃদ্‌পিণ্ডটার ওপর কে যেন ধারালো কতকগুলো নখ বসিয়ে দিলে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে দিবাকর বলল—ও—তাই নাকি! বেশ তো। কবে যাবেন বলুন ?...সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!

যদুনাথ হেসে বললেন—ইচ্ছে আছে কালই যাই।

দিবাকর ঢোঁক গিলে সহজ হবার চেষ্টা করে বলল—বেশ। কালই যাবেন। আমার বাড়ীর ঠিকানাটা...

দিবাকর কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঠিকানা লিখতে শুরু করল। লেখবার সময় তার হাতটা কাঁপতে লাগল থর থর করে। একটা গভীর আনন্দা-ভিভূত অবস্থায় তার সমস্ত সত্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। গীতা...গীতা তার হবে...প্রতিটি মুহূর্ত তাকে কাছে পাবে...এতবড় সম্পদের সে হবে উত্তরাধিকারী! ভুলে গিয়েছিল দিবাকর সে কে? শুধু মনে হচ্ছিল ভগবান মুহূর্তে একটা পথের ভিখিরীকে রাজার ঐশ্বর্য এনে উজোড় করে দিয়েছেন যেন!

গীতা হবে তার—জীবনে আসবে একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সমৃদ্ধি।...

এ যে কল্পনাতীত! কিন্তু কিসের বিনিময়ে সে আজ পেতে চলেছে গীতাকে? হতে চলেছে এতবড সম্পদের উত্তরাধিকারী? দিবাকরের ভিতরের মানুষটি বলে ওঠে—'মিথ্যের বিনিময়ে!' আরো অনেক কিছু বলে উঠতে চায় তার ভিতরের মানুষ। কিন্তু জোর করে তার মুখ বন্ধ করে দেয় দিবাকর।

ঠিকানা দিয়ে এক সময় উঠে দাঁড়ায় দিবাকর। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে—কাল কখন আসবেন আপনারা?

যদুনাথ বলেন,—এই বিকেলের দিকে।

দিবাকর খুশী হয়ে বলে—বেশ। আমি অপেক্ষা করব।

আট

গীতা···গীতা···গীতার স্বপ্নে মশগুল হয়ে দিবাকর পথ চলে। ভাবে, এর মধ্যে একটা চাকরী সে নিশ্চয় জুটিয়ে নিতে পারবে। তারপরে বিয়ে করবে গীতাকে। আর বিয়ের পর গীতা যদি জেনে যায় তার অতীত যাত্রা-জীবনের কথা, তখন সে ক্ষমা চেয়ে নেবে আর নোতুন করে গড়ে তুলবে তার নোতুন জীবন।

ভালোবাসার রঙে মন রাঙিয়ে বাড়ী ফিরতেই দিবাকর চমকে উঠল যাত্রা দলের ননীগোপালকে দেখে। প্রবেশ পথের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ননী। ছেঁড়া জামা-কাপড়, রুক্ষ কেশ, দীর্ণ-জীর্ণ একটা হতশ্রী চেহারা। দিবাকর যেন কেমন দমে গেল।

জিজ্ঞসা করল,—ননী! কি হয়েছে তোর? তুই কাঁদছিস?

ননীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। সে বলল—আমরা মরতে বসেছি মাস্টার। দলের অবস্থা খুব খারাপ! বিমলা অপেরার নন্দ চলে গেছে জেনে দল বায়না হচ্ছে না। অধিকারী ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেল। আমাদের পয়সা-কড়িও দেয় না। ননীর কণ্ঠ বুজে এল কান্নায়।

দিবাকর স্তব্ধ হয়ে গেছে। ননী কাতর স্বরে বলল—মাস্টার, তুমি কি সত্যিই ফিরে যাবে না?

দিবাকর অস্ফুটে বলে—না! আমাকে তোরা ক্ষমা কর। পারিস তো ভুলে যাস্!

ননী ডুক্‌রে ওঠে, বলে—বলছ কি তুমি? জান, দল উঠে গেলে আমরা কতগুলো পরিবার না খেয়ে মরে যাব। সারাজীবন ধরে যাত্রার দলে থেকে এখন কি করে ছাড়ি, বলত? একটা পয়সা নেই কাছে। ধারও পাবনা! যাত্রাদলের লোককে কে দেবে ধার, বল?

দিবাকর বলে—সব বুঝি—সব জানি। তবু আমার ফিরে যাবার কোন উপায় নেই ননী।

সজল কণ্ঠে ননী আবার অনুনয় করে—দলে ফিরে চল মাস্টার। সবাই তোমার আশায় রয়েছে! আমাদের মুখের দিকে চেয়ে তুমি চল! তুমি জান না ছোট নন্দ ছাড়া 'বিমলা অপেরা' একেবারে অচল!

দিবাকর উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল—যখন ছোট নন্দ ছিল না তখন কি করে চলত? তোদের মুখ চেয়ে অনেক সহ্য করেছি ননী, আর আমি সহ্য করব না। আমি আর কিছুতেই যাব না—ঐ পচা, নিরন্ধ্র পরিবেশের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। আমি বাঁচতে চ'ই, আলো চাই; বাতাস চাই। ও জীবন আমার নয়—! আমি ও ঘৃণা করি!

ননী আহতের মত আর্তনাদ করে বলে ওঠে—তুমি যাত্রাকে ঘৃণা কর?

উত্তাল হয়ে ওঠে দিবাকর। বলে—হ্যাঁ। কি আছে ওর মধ্যে? সকলের হাসি, বিদ্রূপ, ঠাট্টা এইত আমাদের পরিচয়? পারবি তুই তোর ছেলে-মেয়েদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে? পারবি তুই দিনের বেলায় বুক ফুলিয়ে বেড়াতে?

দিনে হাসি তামাসা কুড়িয়ে—রাতে বুক ভরা মেডেল নিয়ে হাত পা ছোঁড়ার সার্থকতা কোথায় বলতে পারিস? ভূতের মত—নিশাচরের মত আমাদের জীবন। ওর মধ্যে আমি নেই! তুই যা ননী, আর কোনদিনও আসিসনি। মনে কর তোদের মাস্টার মরে গেছে!

দিবাকর আর দাঁড়াল না, দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল। দু'চোখে হতাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ননী দরজাটার গোড়ায়।

ননীর কথা, দলের কথা, এখন দিবাকরের ভাববার সময় নেই। যে সমাজকে অনেক দিয়ে সে পেয়েছে শুধু ঘৃণা, বিদ্রূপ আর অপমান, সে সমাজের কথা ভাববার জন্য তার মন সাড়া দেয় না। যে সমাজে সে কিছু না দিয়েও পেয়েছে অনেক কিছু, পেয়েছে জীবনের পরম মোক্ষ, যাকে সে ভেবেছে ভগবানের আশীর্বাদের মত, সেই সমাজের কথাই সে প্রাণ মন ভরে ভাবতে চায় এখন।

যাত্রা জীবনের সব কিছু স্বাক্ষরকে সে বাক্স বন্দী করে রাখে। চাকর গণেশকে ডেকে বলে দেয়, যাত্রাদলের কাউকে যেন সে বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়, আর শিখিয়ে দেয় কাল যাঁরা আসছেন এ বাড়ীতে তাঁদের কাছে যেন সে তার অতীত ইতিহাস গোপন রাখে! গণেশ বিস্ময়ে ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

কাপ, মেডেল, মালা, প্রশংসাপত্রের বাণ্ডিল সবকিছুকে সরিয়ে ফেলে দিবাকর। শুধু মাস্টারের ফটোখানা সরাতে গিয়ে সে একটু থমকে যায়। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই ফটোখানা লুকিয়ে ফেলে একটা আলমারীর মধ্যে। কাল যদুনাথ, গীতা এসে যেন তার যাত্রা-জীবনের কোন প্রমাণই না পান।

পরদিন বিকালবেলা দিবাকরের দরজার সামনে যদুনাথের মস্তবড় মোটরকারটা এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামলেন যদুনাথ আর গীতা। ওপরের বারান্দা থেকে ওঁদের নামতে দেখে দিবাকর ত্বরিতপদে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

ওপরে উঠে এলেন যদুনাথ আর গীতা। দিবাকর ওদের এনে বসাল তার সুসজ্জিত ঘরে। পাখাটা চালিয়ে দিয়ে এসে নিজে বসল একটা সোফার ওপর। গীতা এতক্ষণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল। দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের চমৎকার একটি প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়ে সে উঠে এসে দাঁড়াল ফটোখানার সামনে। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে দিবাকরকে প্রশ্ন করল—এ ছবিখানা কে এঁকেছেন?

দিবাকর উত্তর দিল—আমার এক বন্ধু।

প্রশংসা করে গীতা বলল—চমৎকার হাত তো! দেখেছ বাবা, একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছে।

হেসে যদুনাথ বললেন—আর্ট-ফার্ট আমি বুঝি না বাপু! ও তোমাদের জিনিস তোমরাই বিচার কর। আমি সেকেলে জমিদার মানুষ—টাকা—আনা—পাই-টাই বুঝি!

প্রাণখোলা হাসি হাসতে থাকেন যদুনাথ। তারপর বলেন—এ বাড়ী তোমার বাবাই করে গিয়েছিলেন না?

দিবাকর বিনীত ভাবে উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুশী হয়ে যদুনাথ বললেন—আচ্ছা! বেশ বাড়ী তোমার। ঘর ক'খানা আছে?

দিবাকর উত্তর দিল—নীচে-ওপরে মিলিয়ে সাতখানা। রান্নাঘর, বাথরুম আলাদা।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে যদুনাথ বললেন—আচ্ছা। তারপর বললেন—তুমি

একা মানুষ। নীচের তলাটা ভাড়া দিলেই তো পারতে এতদিন। অত ঘর তোমার তো লাগে না।

উত্তরে দিবাকর বলল—আজ্ঞে আমিও একবার ভেবেছিলুম ভাড়া দোব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ও সব ঝঞ্ঝাটে না যাওয়াই ভালো। শেষে কি রকম লোক এসে জুটবে কে জানে। সে তখন আবার এক ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে, তাই···আর তাছাড়া যা রোজগার করি আপনার আশীর্বাদে তাতেই যখন আমার চলে যায় তখন কেন আবার উট্‌কো লোকের ঝামেলায় যাই!

খুব খুশী হলেন যদুনাথ দিবাকরের কথা শুনে। বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ বাবাজী। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর তাইত আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। আবার প্রাণখোলা হাসি হাসতে থাকেন যদুনাথ।

এরপর গণেশ ট্রে-ভর্তি করে চা-জল খাবার নিয়ে আসে। নানান রকমের কেক্ আর বিস্কুট দেখে যদুনাথ উল্লসিত কণ্ঠে বলেন—এ্যাঁ—এ যে কেকের দোকান সুদ্ধ তুলে এনেছো হে! ও গীতা দেখেছিস দিবাকরের কাণ্ড!

সলজ্জ হেসে গীতা মুখ ফেরাল। লজ্জিতভাবে দিবাকর বলল—আজ্ঞে নানান ধরনের কেক খেতে আমার ভারী ভালো লাগে তাই এনে এনে রাখি। আর নিজে খেতে ভালবাসি বলেই অপরকেও খাইয়ে খুশী হই।

যদুনাথ তার কথা শুনে ভারী খুশী হন। বলেন—তোমার খাওয়ার সত্যিই রুচি আছে দিবাকর। কেক সত্যিই একটি পরম উপাদেয় খাবার—হা-হা-হা-হা। আবার প্রাণখোলা হাসি হাসেন যদুনাথ, তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় দিবাকর ও গীতা।

ওঁরা চলে যাবার পর দিবাকর যখন সুখ-স্বপ্নে মশগুল হয়ে বসেছিল ঘরে, সেই সময় চাকর গণেশ এসে দাঁড়াল তার পাশে। অবাক বিস্ময়ে দিবাকরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে এক সময় ডাকল—দাদাবাবু।

চমক ভাঙল দিবাকরের। মিষ্টি সুরে সাধা বীণার একটা তার যেন সহসা ছিঁড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে দিবাকর তাকাল গণেশের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গণেশ প্রশ্ন করে বসল—আপনি যাত্রা করা সত্যিই ছেড়ে দিলেন?

দিবাকর বিরক্ত মাখা কণ্ঠে বলল—হ্যাঁ। তাতে অবাক হচ্ছিস কেন?

গণেশ মনিবের কাছ থেকে এরকম উত্তর আশা করেনি। সে আর কিছু না বলে মাথা নীচু করে চলে গেল। গণেশ চলে যাবার পরই দিবাকর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। তারপর ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল খোলা জানালাটার ধারে। রাত নেমেছে কোলকাতার বুকে। দৃষ্টি পথে যতদূর দেখা যায় দিবাকর দেখল অন্ধকারের কালো চাদরের এখানে ওখানে আলোর বিন্দুগুলো নিঃশব্দে জ্বলছে।

দূরে থেকে ভেসে আসছে ব্যস্ত যানবাহনের শব্দ। দিবাকর তাকাল খোলা আকাশটার দিকে। নীল আকাশের গায়ে তখন পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আর অসংখ্য তারার দল মিট্‌মিট্‌ করে তাকাচ্ছে। ঐ আকাশের গায়ে তারাদের মধ্যে থেকে সহসা ফুটে উঠল একটা অস্পষ্ট মুখ। দিবাকর অপলকে তাকিয়ে রইল। অস্পষ্ট মুখখানি এবারে স্পষ্ট হল। দিবাকর দেখল সে মুখ গীতার। মেঘের ওপর তারার মালা গলায় পরে গীতা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাকে হাত ইসারা দিয়ে ডাকছে। চঞ্চল হয়ে উঠল দিবাকর! দৃষ্টি আর ফেরাতে ইচ্ছে হয় না তার। গীতার মিষ্টি মুখখানা ক্রমে যেন কাছে নেমে আসে। দিবাকরের চোখ ত্নটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গীতা শন্‌শন্‌ করে নেমে আসছে তারাদের মাঝ থেকে। হঠাৎ দিবাকরের কাণের কাছে যেন ডেকে উঠল নন্দ মাস্টার—'দিবাকর—দিবাকর!' চমকে উঠল দিবাকর! এপাশ ওপাশ তাকাল। না, কেউতো নেই। দিবাকর চকিতে তাকাল আকাশের দিকে। তাকিয়েই আবার চমকে উঠল। দেখল দূর আকাশের গা থেকে একটি উজ্জ্বল তারা খসে পড়ছে। খসে পড়া তারা শন্ শন্ করে নীচে নেমে আসছে। শিউরে উঠল দিবাকর। ঠিক সেই সময় তার কাণের কাছে নন্দ মাস্টারের কণ্ঠ আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল—'নিজে যখন কাঁদবি পরকে তখন হাসাতে হবে। এই ত' আর্টিস্ট। হ্যাঁ, এই ত' আমাদের জীবন!' থর থর করে কাঁপতে থাকে দিবাকরের সর্ব শরীর। বুকের মধ্যে একটা উষ্ণ আবেগ তাল গোল পাকিয়ে তার কণ্ঠের ওপর দিকে উঠতে থাকে। রুদ্ধ হয়ে আসে তার নিশ্বাস। কাঁদতে ইচ্ছে করে—প্রবল গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

সহসা ত্ন'হাত দিয়ে মাথার চুলের গোছা মুঠিতে চেপে ধরে আর্ত কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে দিবাকর—যাত্রাপার্টির হিরো! বরুণ আর্টিস্ট।- কান্নায়

ভেঙ্গে পড়ে তার সর্ব শরীর! সে মাথা হেঁট করে কাঁদতে থাকে। সমস্ত শরীর তার কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

এক সময় সে উঠে এসে আলমারী থেকে নন্দ মাস্টারের ছবিটা বার করে তাকায় ছবির দিকে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা মনে হয় সে যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। যেন কোন এক আকর্ষণী শক্তি তাকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সেই বদ্ধ পৃথিবীতে। না-না, সে আর যাবে না, কিছুতেই যাবে না। দিবাকর তাড়াতাড়ি ছবিখানা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে সেটাকে আলমারীর মধ্যে পু'র ফেলল। না কিছুতেই না।

পরের দুঃখের কথা ভেবে সে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সেণ্টিমেণ্টাল ফুল সাজতে আর রাজী নয়—কিছুতেই নয়।

উচ্ছল হয়ে উঠেছে গীতা। তার বিয়ে হবে। সে লুকিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সলজ্জে নিজেকে দেখে। কখন জিভ্ বার করে ভেংচি কাটে নিজের প্রতিবিম্বকে, তারপর খিল্ খিল্ করে হেসে লুটিয়ে পড়ে বিছানার ওপর। এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি ডাকে—দিবাকর—দি—বা—ক র! হঠাৎ তার মনে হয়, কই দিবাকর কালও আসেনি, আজও আসছে না তো! কি হল? লজ্জা? নিজের মনেই হাসল গীতা।

তারপর একসময় বাইরে আসতেই ভারতী দেবী বললেন—হ্যাঁরে, দিবাকর আজও তো এল না। সে কি কনট্রাক্টরীর কাজে বাইরে কোথাও গেছে?

কি একটা ভাবতে ভাবতে গীতা অস্ফুটে বলে—বোধ হয় তাই গেছে মা।

ভারতী দেবী বলেন—সেদিন স্পষ্ট করে তো কিছু বলেও গেল না! আজকালকার ছেলে-পেলেদের বাপু বোঝা ভার।

চিন্তা করতে লাগল গীতা—ভাবল, কাল যাবে নাকি একবার দিবাকরের বাড়ী।

নয়

রোজগার বন্ধ। আয় না থাকলে চলে কি করে? উড়োনচণ্ডী স্বভাব দিবাকরের। যা কিছু ছিল সব শেষ করে ফেলেছে। এখন একটা পয়সাও তার হাতে নেই। এ' কদিন চাকরীর চেষ্টা করেও সে কিছু করে উঠতে পারেনি! কি করবে, দিবাকর কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। এদিকে গীতাদের বাড়ী যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। একটা অজানা শঙ্কায় সে যেন কেমন জড় হয়ে গেছে।

নানা চিন্তায় দিবাকর ঘরের মধ্যে ছট্‌ ফট্‌ করছিল। একসময় সে বাইরের বারান্দায় আসতেই চমকে উঠল। দেখল তার বাড়ীর দরজায় যদুনাথের বড গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে।

গীতা এসেছে! দিবাকর পুলকিত হয় কিন্তু সহজ হতে পারে না।

গীতা অভিমান করে রাগ প্রকাশ করে। দিবাকর তাদের বাড়ী না যাওয়ার জন্যে অনুযোগও করে।

তারপর এক সময় তারা আবার সহজ হয়ে ওঠে। গীতা সলজ্জকণ্ঠে বলে—বাবা মাকে বলছিলেন, সামনের মাসেই দিন ঠিক করবেন! তুমি কি বল?

দিবাকরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। গীতা তাকে হেসে বিদ্রূপ করে। বলে—বিয়ের নামেই তুমি এমন ভয় পাচ্ছ! বিয়ের পর কি করবে?

তারপর যাবার সময় গীতা তাকে নিমন্ত্রণ করে বলে—আগামী বুধবার আমার জন্মদিন। নিশ্চয় এসো কিন্তু! যত কাজই থাক—ওদিন আসা চাই-ই!

গীতা চলে যায়। দিবাকর আবার চিন্তা সাগরে সাঁতার কাটে।

গীতার কথা, নিজের অভাবের কথা, আর ইচ্ছে না থাকলেও তার দল আর দলের লোকজনের কথা তাকে ভাবিয়ে তোলে; একসময়

নিজের পরিচ্ছদের দিকেও চায় দিবাকর। সবই প্রায় জীর্ণ হয়ে গেছে। পোশাকও চাই কিছু। উচ্চ সমাজে মিশতে গেলে পোশাকের প্রয়োজনটা আগে। কিন্তু টাকা? অস্বস্তিতে ছট্ ফট করে দিবাকর। কোথায় পাবে সে টাকা? কে দেবে তাকে? হঠাৎ তার নজরে পড়ল হাতের আঙটিটার দিকে। ওটা বেচলে কিছু ভালো জামা-কাপড় সংগ্রহ করা যায় না কি?

এমন সময় ঘরে ঢোকে দলের হারাধন, সে কেঁদে বলে—ছেলের বড্ড অসুখ, ঘরে একটিও পয়সা নেই। তুমি কিছু না দিলে ডাক্তার আসবে না, মাস্টার।

দিবাকর বিব্রত বোধ করে।

হারাধন দুঃখ করে বলে—অধিকারী বলেছে—সামনের মাস থেকে আর আমাদের মাইনে দেবে না। দল বন্ধ করে দেবে। মাস্টার, তুমি সত্যিই দল ছেড়ে দিলে? তা হলে আমাদের কি হ'বে? আমরা যে না খেয়ে মরব, মাস্টার।

দিবাকর স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে কিছু সময়, তারপর তার হাতের আঙটিটা হারাধনকে দিতে দিতে বলে—নগদ টাকা নেই। এইটা বেচে তুই ছেলের চিকিচ্ছে করগে হারাধন।

হারাধন আপত্তি করে। পরে, ধমক খেয়ে সে আঙটি নিয়ে চলে যায়।

চিন্তায় কাতর দিবাকর। কি করবে ভেবে পায়না। মনে পড়ে, মেডেলের বাক্সে অনেক মেডেল আছে সোনা রূপোর। সেগুলো বেচলে তো সমস্যার সমাধান হতে পারে!

দিবাকর বার করে মেডেলের বাক্স। ঝক্‌ঝকে মেডেলের সারি। সেদিকে চেয়ে দেখে দিবাকর। মনে পড়ে যায়, তার অতীত জীবনের কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত দিনের দু'একটুকরো ছবি।

ভরা আসরে সে অভিনয় করছে। তার অভিনয়ে লোকে মুগ্ধ হয়ে বুকে মেডেল এঁটে দিচ্ছে। দিবাকর সস্নেহে হাত বুলোয় মেডেলগুলোর ওপর। চোখ দুটো তার সজল হয়ে ওঠে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। মন সরে না বেচে ফেলতে। আবার সযত্নে সে তুলে রাখে মেডেলের বাক্সটাকে আলমারীর মধ্যে।

দশ

দিবাকর আবার চাকরীর সন্ধানে বেরোয়। যেমন করে হোক একটা চাকরী চাই তার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরে বহু জায়গায়, কিন্তু কোথায় চাকরী? কে দেবে চাকরী? কি যোগ্যতা আছে তার চাকরী করার? ক্লান্ত অবসন্ন দিবাকর ঘরে ফেরে। পরিশ্রান্ত দেহটাকে ছড়িয়ে দেয় বিছানার ওপর। ভাবতে থাকে আকাশ-পাতাল।

একটি পয়সা নেই। পরণের পোশাক জীর্ণতার চরম সীমায় এসে পৌঁচেছে। মাথার চুলে বহু দিন তেল পড়েনি—অবিন্যস্ত, এলোমেলো হয়ে আছে চুলগুলো। এক সময় হাতের ঘড়িটা খুলে নেয় দিবাকর। ভাবে এটাকে আর রেখে কি লাভ? বাঁচতে হবে তো! এটাকে বেচে ফেললে ক'দিন চলবে তবু। পরের ভাবনা পরে, আর ভাবতে চায়না দিবাকর। ঘড়িটাকে বেচবার জন্যে বেরোয়। নীচে নামতেই দেখা হয় দলের মদন আর তার বৌয়ের সঙ্গে। শীর্ণকায়া মদনের স্ত্রী। চোখে বুভুক্ষার ছাপ। পরণে শতচ্ছিন্ন শাড়ী। ত্ব'চোখে আগুন জ্বেলে সে তার পাশে দণ্ডায়মান স্বামী মদনের হয়ে কথা বলল, কথা বলল নয় অভিযোগ করল। স্বামীকে দেখিয়ে বলল,—মাস্টারবাবু, এ না আপনার দলে সারা জীবন রাজা সেজে এসেছে। তবে আজ তার এমন দশা কেন? ঘরে খাবার নেই। পরণের কাপড় ছেঁড়া, এ কি রকমের রাজা? জানেন আজ ত্ব'দিন ও না খেয়ে আছে!

দিবাকর ধরা গলায় বলে—ওতো আসল রাজা নয় মদনের বৌ, ও হল নকল রাজা। ওকে তো না খেয়েই থাকতে হবে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে দিবাকর—চোখে, মুখে ক্রোধ ফুটিয়ে মদনের দিনে তাকিয়ে বলে—কেন পড়ে আছিস যাত্রা দলে—কেন ভোগ করছিস এত কষ্ট! অন্য কিছু করতে পারিস না তুই?

মাথা নীচু করে থাকে মদন। তার চোখ দিয়ে জল পড়ে টপ টপ করে।

তার হয়ে তার বৌ বলে ওঠে—আমি কতবার বলেছি,—যাত্রা করে কিছু হবে না—ও ছেড়ে দাও। অন্য কিছু কর। না হলে ছেলেপুলে নিয়ে মারা পড়বে। তা কি বলে জানেন? বলে—যাত্রা কখন ছাড়া যায়। দিনমানে ছাড়লেও রাতের বেলা আর তাকে ছেড়ে থাকা যায় না। মনে হয় কাণের কাছে বাজছে বাঁশী, বাজছে বেউলে—বাজছে ক্লারনেট। অমনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। না গেলে মন খারাপ হয়ে যায়।

দিবাকর স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। মদন এবার মুখ তুললে। ভেজা কণ্ঠে বললে—মাস্টার—তুমি কি সত্যিই আর দলে যাবে না?

দিবাকর কিছু বলে না। মদন আবার বলে—জানো, অধিকারী বলছিল দল তুলে দেবে। তুমি না গেলে বিমলা অপেরা চলবে না। সত্যি মাস্টার—তুমি না গেলে আমরা সবাই না খেয়ে মরব। অধিকারী আর টাকা দেবে না। দলের সবাই মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। আমরা সবাই তোমার মুখ চেয়েই আছি।

দিবাকর বলে—আমার আশা তোরা ছাড। অন্য কিছু করে পেট চালাগে যা।

ভারী কণ্ঠে মদন বলে—তুমি তো বলে খালাস। হাতে পয়সা নেই—কি করব বল? একটা পানের দোকান করতেও ৫০৲।৬০৲ টাকা লাগে। কোথায় পাব সে টাকা? কে দেবে?

দিবাকর বলে—টাকা পেলে দোকান করবি? আর যাত্রা করবি না ত?

মদন তাকায় দিবাকরের দিকে। পরে বিস্মিত কণ্ঠে বলে—তুমি যাত্রার ওপর এত ক্ষেপে গেছ মাস্টার? তবে কি আর কোন দিনও যাত্রা করবে না?

দিবাকর দৃঢ় কণ্ঠে বললে—না। এই নে ঘড়িটা, যদি সুমতি হয় তো ওটা বেচে ব্যবসা করগে যা। যাত্রার দল ছেড়ে দে। আর দাঁড়াল না দিবাকর। আবার উঠে এল ওপরে।

আর ঘড়িটা হাতে নিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল মদন আর তার বৌ।

আবার মেডেলের বাক্সগুলো বার করল দিবাকর। মেডেলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে সেগুলোর দিকে চেয়ে সে যেন কেমন বোবা হয়ে গেল!

দূর থেকে তার কানে ভেসে এল যাত্রার জুড়ী বাজনা। দিবাকর বিহ্বল হয়ে গেল। বাজনা তখন তার কানের খুব কাছে বাজতে লাগল। এক সময় উঠে দাঁড়াল সে। চমকে তাকিয়ে দেখল, তার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মদন, বিশু, হারাধন আর ননীর দল। সবাই যেন তার কাছে মিনতি করছে—তুমি দলে ফিরে এস মাস্টার! তুমি না এলে আমরা যে সবাই ভেসে যাব। ভেসে যাবে বিমলা-অপেরা!

দিবাকর দিশেহারা হয়ে পড়ল। আর নিজেকে সামলাতে পারবে না বুঝতে পেরে সে ঘর ছেড়ে ছুটল পথের দিকে।

পথ হাঁটে দিবাকর। মন তার অশান্ত। ঝড় বইছে তার মনে। পথ হাঁটে আর ভাবে, কোথায় পালাবে সে? কোথায় গেলে রেহাই পাবে এদের হাত থেকে?

এদিকে অধিকারী ভেবেছিল রাগ পড়ে গেলে দিবাকর নিশ্চয়ই দলে আসবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায়, দিবাকর আর ফিরে আসে না দেখে সেও বিচলিত হয়ে পড়ল। একদিন দলেব ক'জনাকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল দিবাকরের বাড়ী। দিবাকরকে বললে—আমার দিকে না চাও এই হতভাগাদের দিকে চেয়ে তুমি দলে ফিরে এস নন্দ।

দিবাকর রাজী নয়। সে এই জীবনে ফিরে যেতে একান্ত নারাজ।

অনেক অনুনয় বিনয়েও যখন কিছু হলোনা তখন অধিকারী তাকে স্মরণ করাল নন্দ মাস্টারের কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা। নন্দ মাস্টারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে দিবাকর কেমন উদভ্রান্তের মত হয়ে গেল। চীৎকার করে বলল—তোমরা যাও! যাও এখান থেকে! মনে কর তোমাদেব ছোট নন্দ মরে গেছে। যাত্রার আসরে আমাকে আর কেউ কোন দিনও দেখতে পাবে না—কোনদিনও না।

কথাগুলো বলে দিবাকর ছুটে চলে গেল সেখান থেকে। বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অধিকারী শ্যামলাল আর দলের লোকেরা।

এগার

আজ গীতার জন্মদিন। দিবাকরের নেমন্তন্ন গীতাদের বাড়ী।

কিন্তু হাতে একটাও পয়সা নেই। শেষে চাকর গণেশের কাছে হাত পাতে দিবাকর। গণেশ জানায় টেনেটুনে সংসার চালাচ্ছে সে। কোথায় পাবে বাড়তি টাকা?

ফাঁপরে পড়ে দিবাকর। এমন সময় গণেশ এসে জানায় এক ভদ্রলোক ডাকছেন তাকে। চমকে ওঠে সে। কে জানে আবার যদুনাথ এলেন কি না!

ভয়ে ভয়ে নীচে নেমে আসে দিবাকর। না। যদুনাথ আসেন নি। রঞ্জিত অপেরার মালিক বিশ্ববন্ধুবাবু এসেছেন। দিবাকর 'বিমলা-অপেরা' ছেড়ে দিয়েছে শুনে তিনি মিনতি করেন তাঁর দলে যোগদান করবার জন্যে। মোটা মাইনেরও আশ্বাস দেন। দিবাকর জানায় সে যাত্রা জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্যই।

আর্তনাদ করে ওঠেন বিশ্ববন্ধুবাবু, বলেন—বলেন কি? আপনি যাত্রা জগতের একজন দিক্‌পাল! আপনি যাত্রা ছাড়লে কখনো চলে? চলে আসুন আমার দলে; রাজার হালে রাখব আপনাকে! বিশ্ববন্ধুর কণ্ঠে তোষামোদের সুর।

গম্ভীর স্বরে দিবাকর জানায়—যদি আবার কখনো যাত্রা করি তো ঐ বিমলা-অপেরাতেই করব—অন্য কোথাও নয়।

হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজে।

বিচলিত হয় দিবাকর। সময় যে ঘনিয়ে এল। এতদিন গীতার কাছ থেকে অনিচ্ছাসত্বে পালিয়ে থাকলেও আজ তো সে পালাতে পারবে না! গীতা যে নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গেছে। তাহলে উপায়? হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বিশ্ববন্ধুবাবু, আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন? বেশী নয়। শ'দুই। যত শিগ গির পারি আমি শোধ করে দোব।

বিশ্ববন্ধুর ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি খেলে গেল। সে হাসির অর্থ বাজী মাৎ করেছি। তিনি খুশী হয়ে পকেট থেকে ছু'খানা একশ টাকার নোট বার করে দিবাকরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আরে, সামান্য ছু'শো টাকা আপনাকে দোব তা ধার বলে দোব কি মশাই। নিন্। দরকার হয় আরো দিতে পারি।

দিবাকর কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলল—না না। যথেষ্ট। এতেই হবে আমার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

অর্থ পূর্ণ হাসি হাসতে হাসতে বিশ্ববন্ধু বলেন—আজ তা'হলে চলি। কাল আবার আসব। আপনি একটু ভেবে দেখবেন নন্দবাবু। হে-হে-হে। হাসতে হাসতেই চলে গেলেন বিশ্ববন্ধুবাবু।

নোট ছু'খানার দিকে চেয়ে দিবাকরের যেন মনে হল সে স্বর্গ পেয়েছে হাতে। আর এক মুহূর্তও নয়। ঐ ময়লা পোশাক আর পুরনো শ্লিপারটা পায়ে পরেই সে বেরিয়ে পড়ল গীতাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

পথ চলতে চলতে একটা পোশাকের দোকান দেখে থমকে দাঁড়াল দিবাকর। নিজের ময়লা পোশাকটার দিকে চেয়ে দেখে সে ঢুকে পড়ল দোকানের মধ্যে। দোকানদারকে বলল ভালো প্যাণ্ট আর সার্ট দেখাতে। কিছু পরে নতুন প্যাণ্ট-সার্ট পরা দিবাকরকে দেখতে পাওয়া গেল দোকানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে খুশী হতে। পোশাকের দাম দিয়ে দিবাকর বেরিয়ে আসছিল। দোকানদার বলল—আপনার পুরনো কাপড়-জামাগুলো নিয়ে যান।

নিজের ময়লা জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখে দিবাকর বলল—ওগুলো থাক এখন—পরে নিয়ে যাব।

দিবাকর বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। দোকানদার বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগল তাকে।

এরপর একটি জুতার দোকানে ঢুকে দিবাকর একজোড়া নতুন জুতো কিনে পায়ে পরল। দাম দিয়ে বেরিয়ে আসছে, দোকানদার বলল—আপনার পুরনো জুতোটা? দোকানদারের দিকে না তাকিয়েই দিবাকর বলল—রেখে দিন—কাল নিয়ে যাব।

অবাক বিস্ময়ে দোকানদার আরেকজনের দিকে তাকাল।

গীতার জন্মদিনের উৎসব। গান গাইছিল গীতা অরগ্যান বাজিয়ে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভীড়ে বাড়ী সরগরম হয়ে আছে। দামী দামী উপঢৌকন আর চটকদার শাড়ি-ব্লাউজের ছটায় ঝকমক করছে হল ঘরটা। গান গাইতে গাইতে গীতা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল খোলা দরজাটার দিকে। অপরূপ সাজে সেজেছে সে আজ। দামী শাড়ির সঙ্গে মানান সই ব্লাউজ আর সেই সঙ্গে দামী গহনায় ঝল্‌মল করছে সে। কপালে নিপুণ হাতে টিপ এঁকেছে। টিপের চারপাশে পরেছে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা—যেন তারারা হাসছে ওর সারা কপাল জুড়ে। এলো খোঁপাটার চারপাশ ঘিরে জড়ানো রয়েছে একগাছা বেলফুলের মালা। সে গান গাইছে—খুশীর গান। মন ভরানো গান। ভালবাসার গান।

এমন সময় সু-সজ্জিত দিবাকর এসে ঢুকল সেই হলে। দিবাকরকে দেখে বারেকের জন্য গীতার কণ্ঠের সুরটা যেন বেসুরো হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার গান আরম্ভ করল। দিবাকর মৃদু হাসতে হাসতে এসে বসল একপাশে। তার হাতে উপহারের বাক্সর সঙ্গে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

গান শেষ হল গীতার। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল সারা হলঘরটি।

ব্যস্ত যদুনাথ সকলকে খেতে বসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। অতিথিরা খাবার টেবিলের দিকে এগোলেন। সেই ফাঁকে গীতা দিবাকরকে টেনে নিয়ে গেল বাড়ীটার পিছন দিকে ফুল বাগানের এক নিভৃত কোণে। একটা বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসল ওরা। চাঁদেব আলোয় ঝলমল করছে গীতা। দিবাকর মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল গীতার দিকে। তাকে অমন করে তাকাতে দেখে এক ঝলক হেসে গীতা বলে—কি দেখছ অমন করে?

আবেগ ভরা কণ্ঠে দিবাকর বলল—দেখছি তোমাকে। দেখছি আর ভাবছি—

গীতা চোখ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল—কি ভাবছ?

দিবাকর বলল,—ভাবছিনা—অবাক হচ্ছি!

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে গীতা প্রশ্ন করে—অবাক হ'চ্ছ?

দিবাকর বলল—হ্যাঁ। অবাক হচ্ছি ভেবে কেমন করে আমি তোমার মত মেয়ের মন জয় করলাম!

ডাগর চোখ দুটো আরও বড় করে গীতা বলল—কেন, আমি কি··· ?

তাকে শেষ করতে না দিয়ে দিবাকর বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল—তুমি অদ্বিতীয়া। তোমার তুলনা নেই গীতা!

মুখ ভার করে গীতা বলল—যাঃ! এ তোমার বাড়াবাড়ি!

দিবাকর হঠাৎ গীতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আবেগ ভরা কণ্ঠেই বলতে লাগল—বাড়াবাড়ি নয় গীতা। এ আমার মনের সবচেয়ে বড় সত্য। বিশ্বাস কর, তোমাকে ভালবেসে আমি ধন্য হয়ে গেছি।

গীতা তাকাল দিবাকরের দিকে। তার আবেশ জড়ানো চোখ দুটো একটুকাল স্থির হয়ে রইল দিবাকরের চোখের ওপর। তারপর ধীর কণ্ঠে সে বলল—তুমি আমাকে সারাজীবন এমনি ভালবাসবে? বল? বল না?

গীতার হাতখানা তখনও দিবাকর তার নিজের হাতের মধ্যেই ধরে রেখেছিল। গীতার কথা শেষ হতে সে সেই হাতখানিকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে আবেগে ভেঙে পড়ে বলল—বাসব গীতা– সারাজীবন তোমাকে আমি এমনি ভালোই বাসব।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা চলে যাবার পর যদুনাথ দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন। ভারতী দেবী নিজে হাতে পরিবেশন করতে লাগলেন। একটু বাদে পোশাক বদলে গীতাও এসে বসল সেখানে। খেতে খেতে যদুনাথ বললেন—এখন তোমার ব্রীজ কন্‌স্ট্রাকশনের কাজটা কোথায় হচ্ছে যেন?

চমকে উঠল দিবাকর। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল—আজ্ঞে রাজগড়ে। ফুলেশ্বরী নদীর ওপর।

যদুনাথ প্রশ্ন করলেন—জায়গাটা কেমন? স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো তো?

দিবাকর বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। জায়গা হিসেবে রাজগড় সত্যিই স্বাস্থ্যকর।

যদুনাথ বললেন—তাহ'লে চলনা ক'দিন ওখানে বেড়িয়ে আসি।

হঠাৎ বিষম খেল দিবাকর। সকলে চমকে উঠলেন। দিবাকর সমানে কাশছে দেখে দারুণ ভীত হয়ে যদুনাথ বললেন—কি সর্ব্বনাশ। মাংসের হাড়টার নলিতে আটকায়নি তো?

কাশছিল দিবাকর। কাশির দমকে চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছিল। সে ঐ অবস্থাতেই হাত ইসারা দিয়ে বলল—ভয় নেই। তারপর জল খেল খানিকটা।

জল খাবার পর কাশিটা কমলে আশ্বস্ত হলেন ভারতী দেবী। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি বললেন—হে মা.বিপত্তারিণী—রক্ষা কর মা!

হেসে দিবাকর বলল—আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বিষম কি কেউ খায় না?

যদুনাথ বললেন—তা তো জানি—কিন্তু···

একটু কৃত্রিম রাগের স্বরে গীতা বলল—লাগবেনা বিষম! অত তাড়াতাড়ি যে মানুষে খেতে পারে এ আমার ধারণারই বাইরে ছিল।

মেয়ের কথা শুনে যদুনাথ আর ভারতী দেবী একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

দিবাকর পুনরায় মাথা নীচু করে খেতে আরম্ভ করেছে এমন সময় যদুনাথ আবার পূর্ব কথার সূত্রে ফিরে এলেন,—ভালকথা, রাজগড়ে পরে যাব। চল আমরা এখন গিডিডিতেই যাই। ব্রজমোহন বার বার করে চিঠি লিখছে যাবার জন্যে, অথচ যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। চল, দিন কয়েক ওখান থেকেই বেরিয়ে আসি। দিবাকর, তোমার কাজের ক্ষতি না হলে তুমিও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে পার।

দিবাকর খেতে খেতে বলল—কবে যাবেন?

যদুনাথ বললেন—গেলে—চল না, পরশুদিনই চলে যাই।

দিবাকর বলল—বেশ—আমি রাজী আছি।

বার

নির্দিষ্ট দিনে যদুনাথ, ভারতী দেবী আর গীতার সঙ্গে দিবাকর গিরিডির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যদুনাথ তার মনের কথাই যেন বলেছেন। সেও তাই চাইছিল। চাইছিল কোলকাতা থেকে কোথাও চলে যেতে। মনটাও তাতে হাল্কা হবে। আর গীতা সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই।

আলাদা একখানি ফার্স্টক্লাস কামরায় যদুনাথ চলেছেন তাঁর স্ত্রী, মেয়ে —আর ভাবী জামাইকে নিয়ে গিরিডির পথে।

দিবাকর বসেছিল এক কোণে। বসে তাকিয়েছিল বাইরের খোলা জানালা দিয়ে দূরের অন্ধকার মাঠের দিকে আর মনে মনে রঙীন স্বপ্নের জাল বুনছিল। এক সময় আবার কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল সে। তাকিয়ে দেখল যদুনাথ আর ভারতী দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবার সে তাকাল গীতার দিকে। দেখল গীতাও ঘুমিয়ে পড়েছে। গীতার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দিবাকর কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। হঠাৎ তার ভিতরের মানুষটি ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল—'কি দেখছিস! কাকে দেখছিস!'

দিবাকরের বাইরের মানুষ বলে—'কেন, গীতাকে দেখছি। আমার ভাবী বধূকে দেখছি!'

হি-হি করে হেসে উঠে ভিতরের মানুষটি, ব্যঙ্গস্বরে বলে—'ভাবী বধূ!' তারপর কঠিন হয় সেই স্বর। বলে,—'তুই শঠ। তুই প্রতারক। তুই মরবি। মরবি। মরবি। ফুলের মত মেয়েটাও তোর জন্যে মরবে। যেদিন সে বুঝতে পারবে তুই তাকে ঠকিয়েছিস সেদিন সে হয় বিষ খাবে নয় পাগল হয়ে যাবে। যাত্রাদলের ছোকরা হয়ে তুই কিনা এতবড় মিথ্যে পরিচয় দিয়ে একটা অভিজাত বংশের ঘরে সিঁদ কেটেছিস!'

বিবেকের ধমকে কেমন যেন পাথর হয়ে গেল দিবাকর। সারাদেহ ঘামে ভিজে উঠেছে তার। আর সে তাকাতে পারল না ফোটাফুলের মত

নিষ্কলঙ্ক গীতার মুখখানার দিকে। সে আবার বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

গতিশীল ট্রেনটার একঘেয়ে ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ হচ্ছে। সে শব্দের মধ্যেও দিবাকর যেন শুনল, 'তুই মরবি—গীতা মরবে। তুই মরবি—গীতা মরবে!'

ও শব্দ আর শুনতে পারে না দিবাকর। দু'হাতে কাণ ঢেকে সে চোখ দুটো বুজে ফেলে এলিয়ে পড়ল সিট্‌টার গায়ে।

গিরিডির পথে বেড়াতে বেরিয়েছে দিবাকর। সঙ্গে গীতা আছে। ভিতরের মানুষের ভর্ৎসনা, তার সতর্কবাণী সব কিছুকে মন থেকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সরিয়ে দিয়েছে সব চিন্তা আর ভাবনাগুলোকেও। ভুলে গেছে তার অতীতকে। কিন্তু সে অতীতকে ভুললেও অতীত তাকে ভোলেনি। পথের মাঝে একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক হঠাৎ তাকে নমস্কার জানিয়ে বলেন—এই যে নমস্কার নন্দবাবু।

শুনেই চমকে ওঠে দিবাকর।

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভদ্রলোক বলেন,—এখানেই এসেছেন নাকি আবার? কি পালা এবার এনেছেন মশাই?

দিবাকর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও সামলে নিয়ে রীতিমত অভিনয় শুরু করে—কে আপনি? আপনাকে তো ঠিক—

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলেন—আমাকে আপনি মনে রাখবেন কি করে বলুন? আমি রঘুনাথ দত্ত। সেবার এখানে আপনার দল এসেছিল না পালা গাইতে! সেই যে রাম রাজ্য! আপনার 'রাম' মশাই আমি আজও ভুলিনি!

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দিবাকর বলে—আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা তো!

এবার ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলেন—সেকি মশাই! আপনি বিমলা অপেরার ছোট নন্দ নন?

গম্ভীর কণ্ঠে দিবাকর বলে—না। আপনি ভুল করেছেন।

থমকে যান ভদ্রলোক—অ—তাই নাকি! তা হবে। ছোট নন্দর সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল আছে কিন্তু! আচ্ছা চলি—নমস্কার। কিছু মনে করবেন না মশাই।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। দিবাকর আড চোখে চাইল গীতার দিকে দেখল, গীতাও চেয়ে আছে অপস্রিয়মান ভদ্রলোকটির দিকে।

সহজ কণ্ঠে দিবাকর বললে—চল গীতা!

গীতা চলতে চলতে বললে—ভদ্রলোক খুব লজ্জা পেয়েছেন না!

—হুঁ।—দিবাকর ছোট্ট উত্তর দেয়।

গীতা বলে—ছোট নন্দ বুঝি বিমলা অপেরার খুব বড প্লেয়ার?

দিবাকর আনমনা হয়ে বলে—হ্যাঁ।

গীতা প্রশ্ন করে—তাকে দেখেছ তুমি?

দিবাকর উত্তর দেয়—হ্যাঁ দেখেছি। লোকটা সত্যিই ভালো যাত্রা করে। আর…

গীতা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে—আর…আর কি?

একটু হেসে দিবাকর বলে—ঐ ভদ্রলোক মিথ্যে বলেননি গীতা। ছোট নন্দর চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার সত্যিই কিছুটা মিল আছে।

গীতা আশ্চয হয়—তাই নাকি! তাহলে ছোট নন্দ ত সত্যিই সুপুরুষ বলতে হবে!

চুপচাপ দু'জনে পথ চলছিল। হঠাৎ দিবাকর প্রশ্ন করল—আচ্ছা গীতা, যাত্রা দেখতে তোমার কেমন লাগে?

গীতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—যাচ্ছে তাই। যাত্রা দেখলে আমার কেমন হাসি পায়।

বিস্মিত হ'ল দিবাকর। ধরা গলায় বলল—হাসি পায়?

হাসতে হাসতে গীতা বলল—হ্যাঁ। যাত্রা দেখলে কেবলই আমার ছেলেখেলা-ছেলেখেলা বলে মনে হয়।

তাকে বোঝাবার ভঙ্গিতে দিবাকর বলল—এ তোমার ভুল ধারণা গীতা। ভালো যাত্রা দেখলে তোমার আর ছেলেখেলা বলে মনে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে আবার দিবাকর প্রশ্ন করল—আচ্ছা গীতা, আমি যদি সত্যিই ছোট নন্দ হয়ে যাত্রা করে বেডাতাম তাহলে তুমি আমাকে ভালবাসতে?

গীতা চকিতে তাকায় দিবাকরের দিকে। তারপর ঘৃণায় মুখটা বিকৃত করে বলে—এ রামঃ, না, কক্ষনো ভালবাসতাম না।

দিবাকর বলে—কেন, যাত্রা করে বলে কি ওরা এতই অবজ্ঞার পাত্র!

গীতা বলে—নিশ্চয়ই। যাত্রাদলের লোকেরা নেশা-ভাঙ করে এখানে সেখানে পড়ে থাকে যে। যত সব অশিক্ষিত লোক।

দিবাকর বলে—তবু তো তারা শিল্পী। সমাজে তাদের সম্মানের আসনই তো পাওয়া উচিৎ!

গীতা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলে—তুমি থামত'! যত সব আজেবাজে কথা বলে সময়টা নষ্ট করছ। তার চেয়ে চল ঐ ঝরণাটার ধারে গিয়ে বসি। কি সুন্দর জল ঝরছে দেখ!

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঝরণাটার দিকে তাকাল গীতা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিবাকরও তাকাল সেদিকে। গীতা ওর একটা হাত ধরে বলল—চল ওখানে গিয়ে একটু বসি। একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস—।

সেদিন সন্ধ্যা উৎরে গেলে গীতা আর দিবাকর বেড়িয়ে ফিরল। বসবার ঘরে তখন যদুনাথ আর তাঁর শ্যালক ব্রজমোহন বসে গল্প করছিলেন। দিবাকর ঘরে ঢুকতেই যদুনাথ ব্রজমোহনের দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে বললেন—এই যে দিবাকর এসে গেছে ব্রজ। তারপর দিবাকরের দিকে তাকিয়ে বললেন—দিবাকর, ইনি হলেন ব্রজমোহন চৌধুরী, আমার কনিষ্ঠ শ্যালক।

দিবাকর তাডাতাডি এসে ব্রজমোহনকে প্রণাম করল।

ব্রজমোহন আশীর্বাদ করে বললেন—বোস বাবাজী—বোস।

দিবাকর এসে বসল একটা সোফায়। ব্রজমোহন বললেন—শুনলাম তুমি কনট্রাক্টরী কর? কোন ক্লাস কনট্রাক্টর তুমি?

দিবাকর থতমত খেয়ে বলল—আজ্ঞে আমি…

ব্রজমোহন ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন—প্রশ্নটা অবশ্য আমার করাই অন্যায় হয়েছে। তুমি যখন নদীর ওপর সেতু রচনা কর তখন যে তুমি এ-ক্লাস সেটা তো বোঝাই যায়। জামাইবাবু বলছিলেন…

সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথ বলেন—ব্রজমোহন এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ওদের রাস্তা-ঘাট সব মেরামত হবে এ বছর। আমি ওকে বলছিলাম তোমার কথা। ভালো টাকার কাজ হলে তুমিই কেন নাও না কাজগুলো?

শুনতে শুনতে ঘেমে উঠেছিল দিবাকর। এবারে কথা বলতে গিয়ে অনুভব করল, গলা দিয়ে তার স্বর বেরচ্ছে না। তবু সে জোর করে বিনয়ের

হাসি হেসে বলল—আজ্ঞে এ বছর আমার পক্ষে আর কাজ নেওয়া কি উচিত হবে? এক ঐ ব্রীজটার পেছনেই তো···

ব্রজমোহন বলে উঠলেন—আমি তো জামাইবাবুকে তাই বলছিলাম। তাছাড়া তোমার মত 'এ' ক্লাস কনট্রাক্টরকে প্রভাইড্ করার মত ফাণ্ডও আমাদের নেই। বোঝই তো—ছোট মিউনিসিপ্যালিটি!

ভারিক্কিচালে হাসতে থাকেন ব্রজমোহন। তারপর আবার প্রশ্ন করেন—রাজগড় কোন লাইনে পড়ে?

চমকে ওঠে দিবাকর। এর কি উত্তর দেবে সে। এখন তার সত্যিই মনে হয়, মিথ্যার জাল বুনে বুনে সে তার নিজের সর্বনাশকেই ডেকে এনেছে। নিজের হাতে তৈরী করা ঐ মিথ্যের জালেই তাকে জড়িয়ে যেতে হবে এবার। তবু বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করে দিবাকর বলে—আজ্ঞে সি, পি, লাইনে।

ব্রজমোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন—সি, পি—!

ব্রজমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে দিবাকরের বুকটা দুর দুর করে ওঠে। ভিতরটা কাঁপতে থাকে থর্ থর্ করে। মনের ভাব যথা সম্ভব গোপন করে সে সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়গড়, রাজগড় সব ঐ এক লাইনেই পড়ে।

ব্রজমোহন বলেন—ও—হ্যাঁ, হ্যাঁ। রায়গড়। রায়গড়ের নামটা শুনেছি বটে।

এমন সময় চাকর এসে দিবাকরকে ডাকে—গিন্নীমা ডাকছেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দিবাকর। আর এক মুহূর্তও না বসে সে উঠে পড়ল ভিতরে যাবার জন্যে। যাবার সময় ব্রজমোহন আর যদুনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দায় আসতেই সে ব্রজমোহনের কণ্ঠ শুনে থমকে গেলো। শুনল ব্রজমোহন বলছেন—ভাল করে খোঁজখবর নিয়েছেন তো জামাইবাবু? ছেলেটি সত্যিই 'এ' ক্লাস কনট্রাক্টর তো?

হা হা করে হেসে যদুনাথ বলেন—তোমার এ রোগ আজও যায়নি দেখছি—! অকারণে মানুষকে সন্দেহ করা এবার ছেড়ে দাও ব্রজমোহন। এই সন্দেহ আর অবিশ্বাস করে করে তুমি সারাটা জীবন নিজে কষ্ট পেয়েছ, অন্যকেও কষ্ট দিয়েছ।

ব্রজমোহন গম্ভীর স্বরে বলেন—আমার কেমন যেন মনে হল…মানে আজকালকার খবর তো আপনি সব জানেন না। অগাধ সম্পত্তির ওপর বসে বসে খান আর শুয়ে বসে সময় কাটান। এদিকে দুনিয়ায় যে প্রতি নিয়ত কত কি ঘটছে তার তো—

এবার একটু ধমক দিয়েই বলেন যদুনাথ—তুমি থামতো বাপু, মানুষ চেনাবে তুমি আমাকে ? আমি হাঁ করলে মানুষকে বুঝতে পারি।

পাথরের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিল দিবাকর। ব্রজমোহনের কথাগুলো তার কাণে যেন গরম লোহার মত ছ্যাঁকা দিচ্ছিল। যদুনাথের কথা শুনে সে আশ্বস্ত হল।

যদুনাথ বলছিলেন—ছেলেটির সবদিকটাই আমি দেখেছি হে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। কোথাও কোনো গলদ নেই। খাসা ছেলে। তাছাড়া দিবাকরকে জামাই করার আমার আরেকটা মস্ত কারণও আছে। দিবাকরের কেউ নেই। আমার ঐ একমাত্র মেয়ে, ওর সঙ্গে বিয়ে দিলে মেয়ে আমার পর হবেনা। আমার কাছেই থাকতে পারবে। কি, এবার বুঝতে পারছ আমি বসে খেলেও বিষয় বুদ্ধিতে কাঁচা একেবারেই নই !

খুশী হল দিবাকর। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চমকে উঠল যদুনাথের কথা শুনে। যদুনাথ বলছিলেন—বুঝলে ব্রজমোহন, গিরিডি থেকে ফেরার পথে আমার ইচ্ছে আছে একবার দিবাকরের সঙ্গে রাজগড়টা ঘুরে যাব। শুনেছি জায়গাটা খুবই স্বাস্থ্যকর।

মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল দিবাকরের। তার মনে হতে লাগল, মিথ্যেকে কখন চেপে রাখা যায় না। যেমন জরাজীর্ণ কাপড়কে যতই রিপু করা যাক্না কেন, কোন না কোন অংশ তার ছিঁড়বেই—তেমনি মিথ্যেকে যতরকম ভাবেই চেপে রাখার চেষ্টা করনা কেন, সে ফুটে বেরোবেই।

দিবাকর ভীষণ মুষড়ে পড়ল চিন্তায়।

সারারাত দিবাকর ঘুমোতে পারে না। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, এক সময় বিছানা ছেড়ে সে উঠেই পড়ল। এসে দাঁড়াল খোলা জানালার ধারে। একটা সিগারেট ধরাল। তার কাণের কাছে তখনও বাজছে ব্রজমোহনের কথাগুলো—ভাল করে খোঁজ খবর নিয়েছেন তো জামাইবাবু ? ছেলেটি সত্যিই 'এ' ক্লাশ কনট্রাক্টর তো ?

গীতার ক'টি কথাও মনে পড়ল তার—যাত্রাদলের লোকেরা নেশা-ভাঙ করে এখানে সেখানে পড়ে থাকে যে। যত সব অশিক্ষিত…

দিবাকর কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অস্ফুটে তার কণ্ঠ দিয়ে বেরোয় ছোট্ট দুটি শব্দ—তাহ'লে উপায় ?

সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথের কটি কথাও তার কাণের কাছে ধ্বনিত হয়ে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। দিবাকর শুনতে পায় যদুনাথ যেন বলছেন—বুঝলে ব্রজমোহন, গিরিডি থেকে ফেরার পথে আমার ইচ্ছে আছে দিবাকরের সঙ্গে রাজগড়টা ঘুরে যাব। শুনেছি জায়গাটা খুবই স্বাস্থ্যকর।

আর ভাবতে পারে না দিবাকর। এর পরের পরিস্থিতি ভেবে সে শিউরে উঠল। ঠিক করল, এখানে আর একটি দিনও নয়। গীতাকে সে এভাবে প্রতারণা করতে পারবে না। তার ভালবাসার গায়ে সে কলঙ্ক মাখাতে পারবে না—কিছুতেই নয়। তার চেয়ে সে গীতার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। অনেক দূরে। দিবাকরের অন্তরটা হু-হু করে ওঠে কথাটা ভাবতে। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি ? সে মনে মনে ঠিক করে কনট্রাক্টরীই শিখবে। মন প্রাণ দিয়ে শিখবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, কিন্তু সত্যিকারের 'এ' ক্লাস কনট্রাক্টর হতে গেলে…আর ভাবতে পারে না দিবাকর, মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকে তার।

নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনায় তার অন্তরটা পুড়তে থাকে। ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে দিবাকরের। জীবনটা তার এমনি করেই কি মাটি হয়ে যাবে ? মাথার চুল ধরে টানে দিবাকর। আক্ষেপে ফেটে পড়ে মনে মনেই বলে—যাত্রাদলের হিরো আমি কেন হলাম ? কেন এসেছিলাম এই ঘৃণিত শিল্পের সাধনা করতে ? কি পেলাম এখানে ?

দিবাকর কেঁদে ফেলে। তার দু' কপোল বেয়ে দর দর ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

পরদিন সকালবেলায় দিবাকর এসে যদুনাথকে বললো—আমাকে আজই কলকাতা যেতে হবে।

চমকে উঠে যদুনাথ বলেন—সে কী !

কৈফিয়তের সুরে দিবাকর বলল—আজ্ঞে একটা জরুরী কাজের কথা আমার একটুও মনে ছিল না। আগামী কাল সন্ধ্যায় দার্জিলিঙ থেকে একটা

মস্তবড় পার্টি আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। দার্জিলিঙ-এ একটা মোটা টাকার কাজ পাবার কথা আছে সামনের বছরে। সেই কাজটারই কথাবার্তা পাকা করতে তাঁরা আসছেন। কাল হঠাৎ ডায়েরীটা খুলতেই চোখে পড়ে গেল কালকের এপয়েন্টমেণ্টটা। এরপর না গেলে···

তাড়াতাড়ি যদুনাথ বললেন—না না। যাবে বৈকি। কাজ বলে কথা! বেশ, তুমি তাহলে আজই যাত্রা কর। আমরা দিন দুই বাদে না হয়···

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দিবাকর। বলল—হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনারা আরও দিন দুই কাটিয়ে তবে ফিরবেন।

তের

সেদিন দুপুরবেলার ট্রেণে দিবাকর গিরিডি ছেড়ে চলে গেল, চলে গেল নয় পালাল।

ট্রেণের কামরার মধ্যে একটা কোণের দিকে বসে ভাবছিল দিবাকর! মুখখানা তার থম্ থম্ করছে। চোখ দুটো জ্বালাও করছে। মিথ্যার ইট দিয়ে সে যে প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল এতদিন সে প্রাসাদ তার ভেঙে পড়বে আজ নয় কাল। পড়ুক ভেঙে। সেই স্তূপের সামনে এসে সে একদিন দাঁড়াবে। একান্ত নির্জনে। তারপর চেষ্টা করে দেখবে মিথ্যার বনিয়াদে সে সত্যের ভিত গড়তে পারে কিনা।

ট্রেন ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। দিবাকর তাকিয়েছিল বাইরের ঐ অন্ধকারের দিকে। আর ভাবছিল তার জীবনেও আজ এমনি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একটু আগে দেখা চক্চকে সায়াহ্নের আলো যেমন এখন নিভে গেছে, তেমনি তার গীতাও আজ হারিয়ে গেছে ঐ জমাট অন্ধকারের মধ্যে।

প্রকৃতির এ অন্ধকার অস্থায়ী, সরে যাবে একসময়—দিনের আলো আবার ফুটবে। আবার সোনাগলা সায়াহ্নের আলোয় স্নান করবে এই পৃথিবী। কিন্তু তার জীবনের অন্ধকারে কি আর কোনদিন আলো জ্বলবে? সে কি অন্ধকারের মাঝে থেকে খুঁজে পাবে তার উজ্জ্বল উচ্ছল গীতাকে—খুঁজে পাবে কি তার জীবনের প্রথম প্রেমকে?

তীব্র সুরে বেজে ওঠে ট্রেণের হুইসেলটা—পি—ই।

দিবাকরের অন্তরটাও হাহাকার করে ওঠে। ডুকরে ওঠে মনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। মনে পড়ে, সে চলে আসবার সময় সকলের অলক্ষ্যে গীতা এসে তার কাণে কাণে বলেছিল—কোলকাতা ফিরেই কিন্তু তোমার বাড়ীতে যাব।

মনটা দুলে উঠল দিবাকরের। গীতার আর ক'টি কথাও তার কাণে

বাজল—তোমাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না আমার—কিছুতেই না। কিন্তু কি করব, কাজের ক্ষতি করে……

কাজ—। দিবাকরের বুকের জমাট বাঁধা ব্যথা গলে বেরিয়ে আসতে চায়। আর সহ্য করতে পারে না দিবাকর। সে কেঁদে ফেলে। জানালার বাইরে মুখ রেখে সে কাঁদে—কেঁদে যেন হাল্কা হতে চায় সে।

বাড়ী ঢুকতেই দিবাকর দেখল বিশ্ববন্ধুবাং বসে আছেন তার বসবার ঘরে। দিবাকরকে আসতে দেখে তিনি ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। সোৎসাহে বললেন—এই যে এসেছেন! আমি রোজই এসে এসে ফিরে যাচ্ছি। আজ যেন মনটা বলল. আপনি ঠিক আজকেই আসবেন, তাই গ্যাঁট হয়ে বসেছিলাম আপনার জন্যে।

দিবাকর সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল—আপনার টাকাটা কিন্তু আজ আমি দিতে পারব না বিশ্ববন্ধু বাবু, মাস খানেক পরে…

বিশ্ববন্ধুবাবু তাড়াতাড়ি দিবাকরের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন,—আরে মশায়, কে চাইছে আপনার ও দু'শো টাকা। ও আর আপনাকে দিতে হবে না।

খুশী যেন উপচে পড়ে বিশ্ববন্ধুর কণ্ঠ দিয়ে। বিস্মিত দিবাকর বলে—তার মানে?

পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে বিশ্ববন্ধুবাবু খুশী মাখা কণ্ঠে বলেন--সামান্য দু'শো টাকার জন্যে আপনি কি মনে করেন আমি রোজ রোজ এসে ঘুরে যাচ্ছি? তা নয় মশায় তা নয়। আমি আসছি এইটাতে সই করাবার জন্যে!

কাগজখানার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দিবাকর বলল—ব্যাপার কি বলুনতো? কি এটা?

আনন্দিত কণ্ঠেই বিশ্ববন্ধুবাবু বলেন—আপনার কনট্রাক্ট।

অস্ফুটে দিবাকর বিস্ময় প্রকাশ করে,—আমার কনট্রাক্ট!

বিশ্ববন্ধুবাবু বিনয়ের অবতার হয়ে বলেন—আজ্ঞে মাসিক আটশো টাকা বেতন ধার্য করেছি আপনার। হেঁ-হেঁ-হেঁ!

দিবাকরের মুখখানা কঠোর হয়ে উঠল। সে তাকাল একবার চুক্তিপত্রের দিকে তারপর বিশ্ববন্ধুর দিকে। দিবাকরের চাহনি লক্ষ্য করে বিশ্ববন্ধুবাবু

কেমন যেন থমকে গেলেন। থতমত খেয়ে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা ওটাকে আমি না হয় হাজারই করে দিচ্ছি।

দিবাকর দৃঢ়কণ্ঠে বলল—আপনি হাজার কেন পাঁচ হাজার দিলেও যাব না আপনার দলে।

চমকে উঠে বিশ্ববন্ধুবাবু বললেন—এ্যাঁ! সে কি! আমি যে সবাইকে জাঁক করে বলে ফেলেছি মশাই, আপনি আমার দলে আসছেন।

দৃঢ় কণ্ঠেই পুনরায় বলল দিবাকর—এখন আবার সবাইকে নীচু গলায় গিয়ে বলুন গে আমি আপনার দলে আসছি না।

অনুনয়ের সুরে বিশ্ববন্ধু বলেন—এ—এ আপনি কি বলছেন নন্দবাবু। দোহাই আপনার, আমাকে বেইজ্জত করবেন না। চলে আসুন আমার দলে, আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে মাথায় করে রাখব, রোজ পাঁচ টাকা জলপানি তো দোবই, তার ওপরে ভালো সিগারেট দু'প্যাকেট করে।

দিবাকর যেন ক্ষেপে উঠল এবার। কঠোর স্বরে বলল—আপনি ভুল জায়গায় চার ফেলেছেন বিশ্ববন্ধুবাবু। জেনে রাখুন, আর কেউ এ লোভ সম্বরণ করতে না পারলেও আমি পারব। নিয়ে যান আপনার কনট্রাক্ট। ছোট নন্দ আর যাত্রা করবে না—কক্ষনো না।

আর্তস্বরে বিশ্ববন্ধু বলে ওঠেন—নন্দবাবু, দোহাই আপনার। আমাকে এভাবে বেইজ্জত করবেন না। আমি আপনার পায়ে পড়ছি।

বিশ্ববন্ধু এগিয়ে বসে পড়লেন দিবাকরের পায়ের কাছে। দিবাকর দু'পা পিছিয়ে এসে রাগে ফেটে পড়ে বলল—বিশ্ববন্ধুবাবু, আর অনুরোধ করলে আমি কিন্তু আপনাকে বার করে দিতে বাধ্য হব। আমি যখন বলেছি...

ঠিক এমনি সময় পাগলের মত ছুটে এল বিমলা অপেরার অধিকারী শ্যামলাল তার দলবল নিয়ে। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল—এই তোমার মনে ছিল নন্দ?

দিবাকর স্তম্ভিত হয়ে গেল ওদের দেখে। জীর্ণ, শীর্ণ, বুভুক্ষুর মত চেহারা হয়ে গেছে সকলের। তাদের চোখে মুখে শুধু হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ। দিবাকর আর তাকাতে পারে না দলের লোকগুলোর দিকে। চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অধিকারী শ্যামলাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—আমার বাবা অনেক আশা করে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেছল এই দলটাকে। মাস্টার মশাই তোমার

হাতে এ দলের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে দেহ রেখেছিলেন। তুমি তাদের কথা দিয়েছিলে নন্দ, যতদিন বাঁচবে, এই দলেরই সেবা করবে; এই তোমার পিতিজ্ঞে রাখা? আমি মুখ্যু মানুষ, নয় দোষ করেছিই। তাই বলে এত বড় শাস্তি আমাকে দেবে তুমি? আমার দলটাকে লাটে তুলে দিয়ে তুমি গিয়ে ভর্তি হবে রঞ্জিত অপেরায়?

দিবাকরের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে। সে ধরা গলায় অস্ফুটে বলল—অধিকারী আমি…

শ্যামলাল অনুনয়ের সুরে বলে উঠল,—নন্দ, আমার ওপর আর রাগ করে থেকোনা ভাই। দলে ফিরে চল। আমি কথা দিচ্ছি এবার তুমি যা করতে চাইবে আমি তাতেই রাজী হব। দোহাই তোমার, রাজী হও ভাই। এতগুলো লোক আজ বেকার। এদের মুখের দিকে চেয়ে তুমি দয়া কর।

দিবাকরের চোখ দুটোও তখন কাঁপছে। সে তাকিয়ে দেখল ননীর দিকে। সুন্দর মিষ্টি চেহারা ছিল ননীর। সব পালাতেই সে সাজত নায়িকা। আজ তার সেই মিষ্টি মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। হতাশা আর আশঙ্কায় তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে,—যেন রক্ত মাংসের মুখ এ নয়—কঙ্কালের মুখ। দিবাকর আরও দেখল বিশুকে, হারাধনকে, গজাননকে। ওদের ব্যথামলিন কাতর চোখগুলো যেন বলছে—মাস্টার, তুমি ফিরে চল দলে,—আমাদের বাঁচাও।

দুর্বল হয়ে পড়ছে দিবাকর। তার মনে হয় ওরা তাকে টানছে,—চুম্বকের মত টানছে। দিবাকর তার মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এক সময়ে সে বলল—আমাকে, আমাকে তুমি ক্ষমা কর অধিকারী। যাত্রাদলে ফিরে যাবার আর কোন উপায়ই নেই আমার।

জল ভরা চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল শ্যামলালের। সে অভিমানা-হত কণ্ঠে বলল—তাই যদি হবে তবে বিশ্ববন্ধুবাবু তোমার বাড়ীতে যাতায়াত করছেন কেন? যাত্রা পাড়ায় রটেছে কেন তুমি রঞ্জিত অপেরায় যোগ দিচ্ছ? তুমি একথা অস্বীকার করতে পার নন্দ? বল, একি মিথ্যে কথা?

সহজ শান্ত কণ্ঠে দিবাকর বলল—হ্যাঁ। মিথ্যে কথা, আমি বিশ্ববন্ধু বাবুর প্রস্তাবকে নাকচ করেই দিয়েছি।

দিবাকরের কথা শুনে শ্যামলালের মনে হল যেন তার বুকের ওপর থেকে ভারী পাথরটা সরে গেছে। সে সোৎসাহে বলল—সত্যি! আঃ—বাঁচলাম! আমার যা ভয় লেগেছিল। ভেবেছিলাম দলটা বুঝি এবার সত্যিই উঠে গেল, আর বুঝি আমাদের বাঁচার কোন আশা নেই।

তারপর দিবাকরের দুটি হাত ধরে কাতর আবেদনের সুরে শ্যামলাল বলল—তাহলে আর ভাবনা চিন্তা নয় ভাই। আজ থেকেই তুমি আসর জমাও। তোমার লেখা সেই 'যুধিষ্ঠির' পালাখানাই করাও। তুমি বলছিলে না, যুধিষ্ঠির পালাখানা পেলে করালে যাত্রা জগতে একটা সাড়া পড়ে যাবে? তাই করবে চল। এ পালার জন্যে আমি পিতিজ্ঞেও করছি যত খরচ লাগে দোব। সাজ-পোশাক, অস্তর-শস্তর, আলো-মালো যা তুমি চাইবে তাই তোমাকে জোগাব আমি। লক্ষ্মী দাদা, আর রাগ পুষে রেখ না—দলে চল।

শ্যামলালের কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন হত বিহ্বল হয়ে গেছিল দিবাকর। তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিল, যাত্রা জগতের জমাট অন্ধকারকে সে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে। নতুন আলোর ছটায় ঝল্‌মল করছে আসর। কাণের কাছে সে শুনতে পাচ্ছে নন্দ মাস্টারের কটি কথা—পারবি না বাবা—পারবি না তুই যাত্রাদলের লোকগুলোকে আলোয় আনতে!

শ্যামলাল তখনও তাকে সমানে অনুনয় করে চলেছে—নন্দ, দোহাই তোমার। ফিরে চল ভাই। বিশ্বাস কর, তুমি ছাড়া 'বিমল-অপেরা' চলবে না—চলতে পারে না। এই তোমার পায়ে ধরছি আমি—তুমি ফিরে চল!

চম্‌কে ওঠে দিবাকর। তাড়াতাড়ি শ্যামলালকে সে তুলে ধরে। ধরা গলায় আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—আমাকে—আমাকে একটু ভেবে দেখতে সময় দাও অধিকারী।

শ্যামলাল আশ্বস্ত হয়। সে বলে—বেশ। আজকের দিনটা তুমি ভাব। কাল আবার আমরা আসব।

দিবাকর জবাব দিল না। শ্যামলাল তার দলবল নিয়ে চলে গেল। বিশ্ববন্ধু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন একপাশে। এবার তিনি চাদরের খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দিবাকরের কাছে এসে একটু হেসে বলেন—আমি আজ তাহলে চলি নন্দবাবু। কাল আমিও একবার আসব।

বিশ্ববন্ধু বাবু চলে গেলেন। দিবাকর উদাস দৃষ্টি মেলে সেখানেই দাঁড়িয়ে

রইল আরো কিছুক্ষণ। তার মনের মধ্যে তখন প্রবল ঝড় উঠেছে। একদিকে গীতার আকর্ষণ আর অন্যদিকে তার 'যুধিষ্ঠির'। তার স্বপ্ন, তার আশা, তার আদর্শ, কোনটাকে গ্রহণ করবে সে? ভাবতে ভাবতে যেন উন্মাদ হয়ে উঠল দিবাকর। ঘর ছেড়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। একবার তার মনে হয় যাত্রাদলে ফিরে গেলে গীতাকে ছাডতে হবে। আবার ভাবে তার 'যুধিষ্ঠির' যদি সারা ভারতবর্ষকে জয় করতে পারে তাহলে যে সে মস্ত এক কীর্তি রেখে যেতে পারবে এ জগতে। মৃতপ্রায় ঘৃণিত এক.া শিল্প তার সাধনায় যদি সত্যিই পুনর্জন্ম পায়,—যদি সে সবল হয়ে দশের মাঝে সম্মানের আসন লাভ করে তা কি তখন কম গৌরবের বিষয় হবে? কথাগুলো ভাবতেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। কল্পনার নয়নে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যাত্রার ভরা আসর। 'যুধিষ্ঠির' পালার অভিনয় হচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে গেছেন দর্শকরা। বিস্মিত নয়নে ভাবছেন,—যাত্রায় এ কী করে সম্ভব হল!

দিবাকর যেন আনন্দে মেতে ওঠে। মনে মনে বলে, সে যাবে, হঁ্যা নিশ্চয়ই যাবে, তার সারা জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলবার অত বড সুযোগ যখন তার সামনে এসেছে তখন সে কিছুতেই আর তাকে অবহেলা করবে না। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গীতার মুখ। সুন্দর সেই মুখের দিকে চেয়ে দিবাকর কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। তার মনে পড়ে গীতার জন্মদিনের সেই ছবি। নিরালায় গৃহাঙ্গনের এক পাশে সযত্ন রচিত বৃক্ষ-কুঞ্জের আড়ালে তার পাশে বসে আছে গীতা। আবেশ জড়ানো দুটি আঁখি মেলে আবেগের সুরে সে যেন তাকে বলছে—সারা জীবন তুমি আমাকে এমনি ভালবাসবে?—বল? বলনা?

গীতা।—অস্ফুটে আর্তনাদ করে দিবাকর। মাথাটা তার ঘুরছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে।

মনের মাঝে আবার দ্বিধা জাগে—কোনটা বড—প্রেম না আদর্শ! ভালবাসা না হৃদয়ের নির্দেশ!

চৌদ্দ

গিরিডি থেকে ফিরে গীতা সেদিন একাই এল দিবাকরের বাড়ীতে। চাকর গণেশের কাছে শুনল, দাদাবাবুর খুব কাজ পড়েছে। তিনি বাইরে চলে গেছেন। কবে ফিরবেন বলে যাননি।

হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গেল গীতা।

দিন কয়েক পরে গণেশকে ছুটি দিয়ে দিল দিবাকর। বলল—আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছিরে গণেশ।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল গণেশ—কোথায় যাবে, দাদাবাবু?

উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ধরা গলায় দিবাকর বলল—দূরে—অনেক দূরে কোথাও। তুই অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নে। দিবাকর আন্‌মনা হয়ে পড়ে। গণেশও হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

এদিকে প্রায় একটি মাস হতে চলল দিবাকরের কোন সন্ধানই পেল না গীতা। ইতিমধ্যে আরও বার কয়েক সে গিয়েছিল দিবাকরের নিস্ফল সন্ধানে তার বাড়ীতে। দেখে এসেছে দরজায় তালা ঝুলছে। দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়ল গীতা। দিবাকরের জন্যে মনটা তার ছট্‌ফট্ করতে লাগল!

যদুনাথও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এতদিনের মধ্যে দিবাকরের কোন খবর না পেয়ে তিনি রাজগড়ে খোঁজ করতে পাঠালেন। মেয়ের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন—ভাবিসনি মা, আমি রাজগড়ে খবর করতে লোক পাঠিয়েছি।

রাজগড়ের খবর এল দিন দুই বাদে। কিন্তু সে খবর শুনে শিউরে উঠলেন যদুনাথ। শুনলেন রাজগড়ে কোন নদীই নেই, আর থাকলেও সেখানে কোনো ব্রীজ তৈরী হচ্ছে না। স্তম্ভিত হলেন ভারতী দেবীও! গীতা বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠল যদুনাথের মুখ। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তবে কি ব্রজমোহনের কথাই সত্যি? দিবাকর মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল?

শুনে চমকে উঠলেন ভারতী দেবী। বললেন—সে কি গো!

যদুনাথ বললেন—ব্রজমোহন বলেছিল, দিবাকরের কথাবার্তায় ওর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে! এখন দেখছি···হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল গীতার ওপর। চমকে উঠলেন তিনি। দেখলেন গীতা অজ্ঞান হয়ে গেছে। যদুনাথ বিচলিত হলেন, ভারতী দেবী ভয়ে চীৎকার করে উঠে ছুটে গেলেন মেয়ের কাছে। ডাক্তার ডাকা হল। পরীক্ষা করে আব সব কিছু শুনে ডাক্তাব বললেন—মেণ্টাল শক্ থেকেই হয়েছে।

এদিকে প্রেম বড় না আদর্শ বড, এরই সংঘাতে দিবাকর জর্জরিত হয়ে পড়েছে। অবিরত ছট্‌ফট্ করছে সে। একসময় সে বহু কষ্টে মনটাকে শক্ত করে ফেলে। প্রেমই তার কাছে বড। শ্যামলাল দেরী করে ফেলেছে। আজ আর তার ফিরে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই।

গীতাকে সরিয়ে রেখে সে আজ আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। গীতাকে বাদ দিয়ে এখন আর তার পক্ষে কিছু ভাবা সম্ভব নয়। গীতা যখন যাত্রাকে ঘৃণা করে তখন সে আর ওদের কথা ভাববে না। ভাববে না তার অতি যত্নে লেখা 'যুধিষ্ঠিরের' কথা! জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে গীতাকেই এখন তার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। দিবাকর সারাটি পথ ভেবে মনস্থির করে ফেলে। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই কেমন যেন থম্‌কে যায় সে। তার মনে হয় যার বাডীতে সে মানুষ হয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে, সেই তিনি কি তাকে ক্ষমা করবেন! তাঁর কাছে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করার জন্যে তাঁর আত্মা যদি তাকে অভিসম্পাত দেয়? দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় দিবাকরের। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাস্টারের অশ্রু সজল মুখখানি। তিনি যেন বলছেন—এরা খেতে পায় না, পরণে ছেঁড়া কাপড, ছেলে-পুলেদের মানুষ করতে পারে না। তবু কিসের মোহে এরা এখানে পডে থাকে তা জানিস দিবাকর? এরা সত্যিকারের অভিনেতা তাই। এরা শিল্পী এরা সৃষ্টি করে। আর সেই সৃষ্টির আনন্দে এরা ভরপুর থাকে সব সময়।

দিবাকরের মনের দৃঢ়তা এক মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আবার সে এসে জডিয়ে পডে সেই দ্বন্দ্বের মাঝে; প্রেম বড না আদর্শ বড! ভালবাসা বড না হৃদয়ের নির্দেশ বড! উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় দিবাকর। বাঁচবার জন্যে

দু'হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খোঁজে। চাকরী! একটা চাকরী তার চাই, সে যেমন করে হোক।

পথে বেরিয়ে পড়ে দিবাকর চাকরীর সন্ধানে। এক দরজা থেকে আরেক দরজায় ঘোরে দিবাকর। চেনা অচেনা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে মিনতি করে বলে—"আমাকে একটা কাজ দেবেন। ভদ্রভাবে বাঁচবার মত কাজ?"

জবাবে শোনে—কোয়ালিফিকেশন?

ধরা গলায় দিবাকর বলে—ডিগ্রী নেই তবে লেখাপড়া জানি কিছুটা।

—কোন আশা নেই তবে।

হতাশ হয়ে বেরিয়ে যায় দিবাকর।

সন্ধ্যা নামে শহরের বুকে। কর্মব্যস্ত সমস্ত শহরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দিবাকর এসে বসে পার্কের একটা নিজন কোণে। পথশ্রমের ক্লান্তিতে তার সর্বাঙ্গ ভারী হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে ভারী হয়ে উঠেছে তার মনটাও। একটা চাপা কান্না যেন তার সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাপিয়ে ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। এই তো তার জীবন। কি মূল্য আছে তার? কোন মুখে আজ গিয়ে সে দাঁড়াবে তার গীতার কাছে? গীতা! ওঃ, কতদিন দেখেনি সে গীতাকে। গীতা না জানি কতবার এসে এসে ফিরে গেছে। মনটা কেঁদে ওঠে তার। ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় এখুনি, এই মুহূর্তে। কিন্তু কি করে যাবে সে? যদুনাথ যদি বিয়ের দিন স্থির করতে চান? তখন কি করে এড়াবে সে? না না, এখন যাওয়া নয়! আগে চাকরী পেতে হবে তারপর গীতার কাছে যাবার জন্যে পা বাড়াবে।

এদিকে রোজই সন্ধ্যায় শ্যামলাল আর দলের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলেছে। এই বুঝি নন্দ এসে পড়ল। কিন্তু কত সন্ধ্যাই তো চলে গেল অথচ নন্দকে কেউ দেখতে পেল না। তার খবর আনতে গিয়েছিল হারাধন। ফিরে এসে সে ম্লান মুখে বলল—মাস্টার আজকাল বাড়ীতে থাকেই না শুনে এলাম। তার দরজায় তালা ঝুলছে দেখলাম।

অধিকারীর সঙ্গে আর সবায়েরই মুখ কালো হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশায় ভেঙে পড়ে অধিকারী শ্যামলাল বলে—নন্দ তাহলে সত্যিই যাত্রা করা ছেড়ে দিল রে! যাত্রাদলে সে আর সত্যিই ফিরে আসবে না। কথার শেষে অধিকারীর চোখ দুটো জলে টল্‌টল করে।

পনর

যতুনাথ গীতার দিকে আজকাল তাকাতে পারেন না। ফুলের মত গীতা দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনটা তার মুচড়ে ওঠে। সেদিন তিনি নিজে বেরোলেন দিবাকরের খোঁজে। দিবাকরের বাড়ীতে এসে দেখলেন দরজায় তালা ঝুলছে। তিনি এসে দাঁড়ালেন পাশের একটা বাড়ীর দরজায়। দরজা খুলে দাঁড়াল একটি যুবক—কাকে চাই ?

যতুনাথ বললেন—আচ্ছা বাবা, এই যে তোমাদের পাশের বাড়ীতে এক ভদ্রলোক থাকেন তিনি কি করেন তুমি কিছু জান ?

যুবক একবার দিবাকরের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখে বলল—ও,—নন্দবাবু !

যতুনাথ বিস্মিত হন—নন্দবাবু !

যুবক বলল—হ্যাঁ। ও বাড়ীতে তো নন্দবাবু থাকেন।

যতুনাথ কুণ্ঠিত হয়ে বলেন—কিন্তু ওঁর নামতো জানতাম দিবাকর।

যুবক মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ দিবাকরবাবুই তো নন্দবাবু। নন্দ ওঁর যাত্রার নাম।

বিস্মিত যতুনাথ প্রশ্ন করেন—যাত্রার নাম ?

যুবক বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিমলা অপেরার একজন সেরা প্লেয়ার উনি ! যাত্রা জগতে উনি ছোট নন্দ নামে বিখ্যাত।

যতুনাথ অনুভব করলেন তাঁর চোখের সামনেকার বাড়ীঘর, গাছপালা, মানুষ, এই যুবক সব যেন দুলছে। এক সময়ে দেখলেন দিবাকরের বাড়ীটাও যেন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ছে তাঁর দিকে। ভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

যুবক প্রশ্ন করল—নন্দবাবুকে আপনার দরকার বুঝি ?

চমক ভাঙে যতুনাথের। চেরা বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলেন—না না, তাকে আমার দরকার নেই, বাবা। কোন দরকার নেই। বলে তিনি যতটা

সম্ভব তাঁর টলায়মান শরীরটাকে সামলাতে সামলাতে ফিরে যান তার গাড়ীতে। ড্রাইভারকে হুকুম করেন,—গোবিন্দ, বাড়ী চল! শিগ্‌গির!

গোবিন্দ জোরে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে।

যদুনাথ অনুভব করেন গাড়ীর ঐ তীব্র গতিতে ঘূর্ণায়মান চাকা গুলোর মত তাঁর মাথাটাও যেন ঘুরছে বন্‌বন করে।

বাড়ী ফিরতে ভারতী দেবী ব্যগ্রভাবে এসে দাঁড়ালেন যদুনাথের সামনে, —দিবাকরের কোন খবর পেলে গো?

গম্ভীর যদুনাথ এসে বসলেন একটা সোফায়। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—পেয়েছি তার খবর।

সে কথা শুনে পাশের ঘরে বিছানায় শায়িতা গীতা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশীতে। খাট থেকে নীচে নামবার জন্যে সে পা বাড়াল, কিন্তু নামা তার হল না বাবাব কথা শুনে। যদুনাথ বলছিলেন—দিবাকর আমাদের ঠকিয়েছে।

ভারতী দেবী দারুণ বিস্মিত হয়ে বললেন—সেকি!

যদুনাথ রাগে ফেটে পড়ে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলছি তার একটুও মিথ্যে নয়। ব্রজমোহন ঠিকই ধরেছিল। দিবাকর একটা মিথ্যেবাদী, শঠ, প্রতারক।

শিউরে উঠে গীতা দু'হাত দিয়ে কাণ দুটো চেপে ধরে বলে উঠল—না না, এ সত্যি নয়! কক্ষনো সত্যি নয়।

যদুনাথ ভারতী দেবীর কথার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন—সব সত্যি। আমি ভালো করে খোঁজ নিয়ে এসেছি! সে কনট্রাক্টর নয়—যাত্রাদলের ছোক্‌রা! নাম নন্দদুলাল!

ভারতী দেবী চমকে উঠে বললেন—এ্যাঁ।

যদুনাথের কথা শুনে গীতাও বারেকের জন্য থমকে গেল। তার চোখের সামনে চকিতে ভেসে উঠল গিরিডির সেই পথের দৃশ্য। একটি ভদ্রলোক এসে দিবাকরকে নমস্কার করে বললেন—নমস্কার নন্দবাবু……

গীতা কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল বিছানার ওপর। অস্ফুটে বলতে লাগল—এ তুমি কি করলে আমার। আমি এখন কি করব? বলে দাও, আমি এখন কি করব।

ষোল

একটি মার্চেন্ট অফিসের দরজা দিয়ে প্রফুল্লচিত্তে দিবাকর বেরিয়ে এল। পানের দোকানের আয়নায় তাঁর হতাশা ক্লান্ত চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে সে আবার পথ চলতে লাগল। তার মন আজ আনন্দে ভরপুর ! সে চাকরী পেয়েছে।

সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে সে চাকরীতে যোগদান করবে। নিয়োগপত্রখানা বার করে সে চোখের সামনে মেলে ধরে। মাসিক দেড়শ টাকা মাইনে। পরে উন্নতির আশাও আছে। দিবাকর পুলকিত হয়। চঞ্চল হয়ে সে আরও দ্রুত এগোয়। তারপর সামনে একখানা চলন্ত বাস দেখে তাতে লাফিয়ে উঠে বসে। উদ্দেশ্য গীতাদের বাড়ী যাওয়া। আজ তো আর গীতাদের বাড়ী যেতে কোন বাধা নেই! আজ যদি যদুনাথ তাকে বিয়ের ব্যাপারে মতামত দিতে বলেন তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গেই তার মত জানাতে পারবে। কোন দ্বিধা নেই আর আজ। বিয়ে হয়ে যাবার পর সে সময় মত একদিন গীতাকে সব কিছু খুলে বলবে। ক্ষমা চেয়ে নেবে তার মিথ্যা পরিচয় দেবার জন্যে। গীতা কি তখন তাকে ক্ষমা করবে না? নিশ্চয়ই করবে।. গীতা যে তাকে ভালবাসে।

বাস ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে। দিবাকরের মনে পড়ে গীতার এক দিনের ক'টি কথা। গীতা বলেছিল - কাল বাবা মাকে বলছিলেন, সামনের মাসেই দিন ঠিক করবেন তিনি। তুমি কি বল? আনন্দে শিরশির করে ওঠে দিবাকরের সর্বাঙ্গ।

সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে বাসটা ছুটে চলেছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সূর্যের আলোয় লালচে রঙ ধরেছে। দিবাকরের মনের মধ্যেও তখন রঙের খেলা চলেছে। দৃষ্টি তার খোলা জানালার বাইরে ঐ দূর মাঠের ওপর দিয়ে গিয়ে মিশে গেছে একেবারে দিকচক্রবালে। সে

তখন ভেবে চলেছে গীতার কথা। গীতা, গীতা তাকে ভালবাসে। আজ বাদে কাল গীতা তার বধূ হবে। গীতা বলেছিল তার সবচেয়ে প্রিয় রঙ হল আকাশী। আকাশী রঙের শাড়ি, আকাশী রঙের ব্লাউজ, আকাশী রঙের আর কি হওয়া উচিত—ভাবতে থাকে দিবাকর। মনে পড়ে আর একদিনের কথা, গীতা বলেছিল—সোনা, হীরে, পান্না আমার কিছু চাই না, তোমাকে কাছে পেলেই আমার সব পাওয়া হবে। আমাকে তুমি একা রেখে যেওনা। দিবাকর বলেছিল—আমিও তো তাই চাই গীতা—কিন্তু তোমার বাবা মা, তারা কি ছাডবেন তোমাকে ?

গীতা বলেছিল—বারে, মেয়ে তা ব'লে শ্বশুর বাডী যাবে না!

হেসে দিবাকর উত্তর দিয়েছিল—মেয়ের শ্বশুর-শ্বাশডী নেই বলেই তো তোমার সঙ্গে তাঁরা আমার বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। মেয়েকে কাছ ছাডা করতে তাঁরা পারবেন না।

গীতা বলেছিল—তুমি থাম তো। দেখো, আমি ঠিক তোমার সঙ্গে চলে যাব।

গীতাকে আবেশে জডিয়ে ধরে দিবাকর বলেছিল—তাহলে আমার চেয়ে খুশী বোধহয় আর কেউ হবে না গীতা।

হঠাৎ একটা ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে দিবাকর লাফিয়ে ওঠে। তন্দ্রা ছুটে যায় তার। চমকে তাকিয়ে দেখে, বাসটা একটা মানুষকে প্রায় চাপা দিয়ে ফেলেছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছে।

পাশ কাটিয়ে আবার পূর্ব গতিতে ছুটে চলল বাসটা। দিবাকর আবার স্বপ্ন রাজ্যে ডুব দিল। তার রঙীন মনে রঙীন স্বপ্নের বেনারসী বুনে চলল।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। লাজুক পদে দিবাকর এসে দাঁড়াল গীতাদের বাডার গেটের সামনে। বুকটা তার দুর দুর করছে। অনেক দিন পর সে এসেছে দেখে না জানি গীতার বাবা-মা কত কৈফিয়ৎ দাবী করবেন। গীতা না জানি কত অভিযোগ করবে কোন খবর না দেওয়ার জন্যে। দিবাকরের হাতে ধরা একগুচ্ছ টাট্‌কা রজনীগন্ধার ছডা। ফুলের গুচ্ছটাকে নাকের কাছে এনে প্রাণ ভরে আঘ্রাণ নেয় সে। তার মনটা ভরে ওঠে। সে তাকায় অদূরের বাডীটার দিকে। সারা বাডীতে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। দিবাকর ওপরের একটা ঘরের দিকে চেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে। ও ঘরখানা গীতার। সারা বাড়ীটা একবার যেন ঝলসে উঠল আলোর ঝলকানিতে।

চমকে উঠে দিবাকর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মেঘ করেছে আকাশ জুড়ে। মেঘ ডাকে গুড গুড করে। হাওয়া উঠেছে,—উত্তুরে হাওয়া। দিবাকর তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের কাছে। নিজের দিকে একবার তাকাল দিবাকর, তারপর গেট খুলে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বাড়ীটার দিকে।

ড্রইংরুমে বসে ছিলেন যদুনাথ। একটা আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে তিনি গড়গড়া টানছিলেন। আর চোখ বুজে বোধহয় ভাবছিলেন তাঁর মেয়ের ভবিষ্যতের কথা। তাঁদের এক মাত্র মেয়ে একটা ভণ্ড শয়তানকে মন দিয়ে আজ জ্বলে পুড়ে মরছে। মেয়ের দুঃখে যদুনাথও পুড়তে থাকেন। শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন কে যেন তাঁকে প্রণাম করছে। চোখ দুটো খুলে প্রশ্ন করলেন—কে?

জবাব এল—আজ্ঞে আমি,—দিবাকর!

চমকে উঠলেন যদুনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত উঠে বসলেন তিনি। দিবাকর যদুনাথের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ল। যদুনাথ হুঙ্কার ছাড়লেন—কি চাই তোমার এখানে?

চমকে উঠল দিবাকর। বুঝতে পারল না যদুনাথ এ সব কি বলছেন। বাইরে মেঘের গর্জ্জন। খোলা দরজার সামনে টাঙানো ভারী পর্দাটা পত্‌পত্‌ শব্দ করে উড়ছে। দিবাকর কিছু বলতে যাবে যদুনাথ আবার হুঙ্কার ছাড়লেন—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও তুমি!

দিবাকর হতবিহ্বল কণ্ঠে বলল—আজ্ঞে আমি—আমি দিবাকর।

যদুনাথ দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি চলে যাও এখান থেকে। যাও—!

ঠিক সেই সময়ে ড্রইংরুমে এসে দাঁড়ালেন ভারতী দেবী। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দিবাকর তাঁর দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল—আজ্ঞে ওঁর কি শারীরিক কোন··· ?

না।—এবার প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়লেন যদুনাথ।

বাইরে মেঘ ডাকছে জোরে জোরে। বিদ্যুৎ ঝল্‌সাচ্ছে বার বার। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত যদুনাথ এগিয়ে এলেন দিবাকরের খুব কাছে। দু'চোখে আগুন জ্বেলে কঠিন স্বরে বললেন—আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে আমি তোমাকে পুলিশে দোব। ভণ্ড, জুয়াচোর, লম্পট কোথাকার! তোমার এতবড় সাহস, তুমি আমার আভিজাত্যে ঘা দিতে এসেছিলে!

দিবাকর আর্তস্বরে বলে—আজ্ঞে, এসব আপনি কি বলছেন ?

যতুনাথ ক্রোধে ফেটে পড়েন— চুপ কর ! তোমার প্রতারণায় ভুলে আজ আমার কত বড় সর্বনাশ হয়েছে তা জান ? গীতা…

গীতা ! কি, কি হয়েছে তার ? সে ভাল আছে তো ?—দিবাকর ব্যাকুল হয়ে উঠল।

যতুনাথ তার ব্যাকুলতা বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠলেন—তার ভাল মন্দ কোনটাই আর তোমাকে দেখতে হবে না। আজ থেকে তার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি যাও ! যাও বলছি !

দিবাকর তখনও বুঝতে পারছে না। বোকার মত বলে ফেলল—আজ্ঞে আমার অপরাধটা কি তাতো এখনও বুঝতে পারলাম না। আমি কী এমন সর্বনাশ করেছি যার জন্যে…

আবার কৈফিয়ৎ চাইছ স্কাউণ্ড্রেল। লজ্জা করে না তোমার ? বড় কনট্রাক্টরের মুখোশ পরে মিথ্যেবাদী, ভণ্ড, লোফার,—একটা, যাত্রাদলের ছোক্‌রা তুমি…দারোয়ান !—রাগে চীৎকার করে ফেটে পড়লেন যতুনাথ। আর সেই মুহূর্তে দিবাকারের অবশ হাত থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছটি মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে গেল।

দারোয়ান আসতে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা দিবাকরকে দেখিয়ে যতুনাথ চীৎকার করে বলে উঠলেন—এ লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দে।

মেঘ ডাকল আবার গুড়্ গুড়্ করে। দিবাকরের কোন অনুভূতি নেই দেহের। দারোয়ানটা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। ঠিক সেই সময় সেখানে এসে দাঁড়াল গীতা উন্মাদিনীর মত। গীতার সে চেহারা আজ আর নেই। অনেক ক্ষয়ে গেছে। বড় বড চোখ দুটোর কোণে কালি পড়েছে। লাল লাল ঠোঁট দু'খানা শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে। আর দেহের সেই গোলাপী রঙের ওপর একটা তামাটে রঙের প্রলেপ পড়ে তাকে শ্রীহীনা করে তুলেছে।

সে আর্তস্বরে বলে ওঠে—ওকে—কে,—কে ও বাবা, কাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি ?

যতুনাথ ছুটে এসে ধরলেন মেয়েকে। স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন—একটা ভণ্ডকে, শয়তানকে মা। তুমি ভিতরে চল ! ডাক্তারবাবু তোমাকে উঠতে নিষেধ করেছেন মা !

গীতার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তখন। চোখ দুটি তার তখনও খোলা দরজার দিকে স্থির নিবদ্ধ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে বাইরে, মেঘ ডাকছে।

গীতা বলল—আমি জানি ও এসেছিল। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছ! বেশ করেছ, বেশ করেছ! আমি খুব খুশী হয়েছি,—খুব খুশী হয়েছি!

কথাগুলো বলতে বলতেই গীতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এতদিনের জমাট কান্না যেন হঠাৎ আঘাত পেয়ে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে থাকে। কাঁদে গীতা—হু-হু করে কাঁদে।

বাইরে তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজেছে গাছপালা, ভিজছে পথঘাট, ভিজছে দিবাকর। অজস্র জলধারায় স্নান করতে করতে চলেছে সে। ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন দিকে দৃষ্টিও নেই। অসংযত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে দিবাকর। কাণের কাছে মেঘ গর্জনে ধ্বনিত হচ্ছে যদুনাথের শেষের কটি কথা—মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, লোফার একটা, যাত্রাদলের ছোকরা··· যাত্রাদলের ছোকরা।—যাত্রাদলের ছোকরা! মাথার মধ্যে আগুন জলছে দিবাকরের। রক্তের দোলায় তার সমস্ত দেহ কাঁপছে থরথর করে। পাশ দিয়ে দ্রুতগতি মোটর চলে যায়। যাবার সময়ে পথের কাদা খানিকটা ছিটিয়ে দিয়ে যায় তার সর্ব্বাঙ্গে। দিবাকরের সেদিকে লক্ষ্য পড়ে না। তার ভিতরের মানুষ তাকে ব্যঙ্গ করে বলে—'জাতে উঠতে চেয়েছিলি না? কেমন জব্দ হয়েছিস। দাঁড়কাকের আবার ময়ূরপুচ্ছ ধারণের সখ। যে পথের পথিক তুই, সেই পথেই তোর চলা উচিত। ফিরে যা—ফিরে যা যাত্রাদলে। গিয়ে আঁকড়ে ধর তোর অবলম্বনকে। উঁচু তলার মানুষদের সঙ্গ পাবার বৃথা চেষ্টা ছেড়ে নীচুতলার ওদেরকেই বুকে টেনে নে। ভুলে যা গীতাকে! ভুলে যা রাজত্ব ভোগের স্বপ্ন।

সতের

বহুদিন অপেক্ষা করে থেকে শ্যামলাল মনস্থির করে ফেলল। ব্যথা ভরা কণ্ঠে বলল সবাইকে ডেকে—আর কি হবে আগলে থেকে। নন্দ না থাকলে এ দলের ওপর লোকের ভক্তি হবেনা। আমি সব বেচেই দোব। বিশু, কালই তুই রঞ্জিত অপেরার বিশ্ববন্ধুকে খবর দিস! তাকেই আমি সব বেচে দোব। ভয় নেই তোদেরও দোব কিছু কিছু। আর নন্দকে দোব···। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় বলল—কি দোব জানিস? তার বড় সাধের লেখা এই যুধিষ্ঠির পালাখানা। সে বলেছিল এই পালাখানা নামাতে পারলে যাত্রা নাকি উঁচু আসনে বসতে পারবে। যাত্রাদলের শিল্পীদের আর কেউ ঘেন্না করবেনা। হায় হায়, তখন যদি ওকে আমি এই পালাখানা করতে দিতুম, তাহলে বোধহয় ও দল ছেড়ে চলে যেত না। ওঃ, বড্ড ভুল করেছিরে—বড্ড ভুল করেছি। কথাগুলি বলতে বলতে কেঁদে ফেলে অধিকারী। যারা সেখানে ছিল তাদেরও চোখে জল এল।

একটু পরে অধিকারী মদনের হাতে যুধিষ্ঠির নাটকের পাণ্ডুলিপি খানা দিয়ে বলল—মদ্‌না, এই নে, পালাখানা কাল সকালে গিয়ে নন্দকে দিয়ে আয়, আর, আর তাকে বলিস, আমাদের দল, আমাদের বিমলা অপেরা উঠে গেছে। কান্নায় বুজে আসে অধিকারী শ্যামলালের কণ্ঠ।

মদন পাণ্ডুলিপি খানা হাতে নিয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগল। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল হারাধন। মদনের শতছিন্ন কাপড়খানা দেখে সে ভেজা গলায় বললে—সারাজীবন যাত্রার রাজা সেজে কি পেলি রে মদন?

কাঁপা স্বরে মদন বলে—যাত্রাদলের রাজার এর চেয়ে বেশী পেতে নেই রে। দেখলি না আমাদের নন্দ মাস্টার অনেক পেতে চেয়েছিল বলে তাকে দল ছেড়ে পালাতে হল।

চোখের জল মুছে মদন বলল—আমি তাহলে যাই অধিকারী। কাল

সকালে এখানা মাস্টারকে পৌছে দিয়ে আমিও বিদায় নোব। যাত্রা-পাড়ায় আর আসব না।

কাঁদতে কাঁদতে মদন চলে গেল সেখান থেকে। অধিকারীও কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সারারাত্রি কেটে গেছে একটুও ঘুমোয়নি দিবাকর। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বার বার প্রশ্নটাকে এড়াতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। কাণের কাছে অহরহ প্রশ্নটা যেন বেজেই চলেছে বেসুরো, বেতালা সঙ্গীতের মত—গীতা কি তাকে আর কখনও ভালবেসে কাছে ডাকবে না? কখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, কখন পাখীরা গাছে গাছে কাকলী তুলেছে দিবাকরের তাও খেয়াল নেই। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে এতক্ষণ ডুবিয়ে রেখেছিল, যেন লুকিয়ে বেঁচেছিল লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে। হঠাৎ যখন তার তন্দ্রা ছুটল, দেখল ভোরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঘরের ভেতরটুকু। তার সর্বপ্রথম চোখ পড়ল দেওয়ালে টাঙানো মেডেলের বাক্সের দিকে। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তে একসময় এসে দাঁড়াল সেখানে। একটা অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল মেডেল-গুলোর দিকে। সে যেন দেখতে পেল প্রতিটা মেডেল জীবন্ত হয়ে যেন তাকে বলছে—তোমার শিল্পী জীবনকে সার্থক করে তোল। ভুলে যাও গীতার কথা। তোমার স্বপ্ন সার্থক হলে দেখবে গীতা আপনিই তোমার কাছে ছুটে আসবে।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল দিবাকর—না-না-না। আমাকে আর ওপথে যেতে বলো না, ওপথে আমি আর যাব না। ওপথে গিয়ে আর আমি ঘৃণা কুড়োতে পারব না—কিছুতেই না।

হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা সোনার মেডেলের ওপর। স্থির হয়ে গেল দিবাকরের দৃষ্টি। চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মেডেলটার মধ্যেকার ছবি। সে দেখল ময়নাগড়ের রাজবাড়ীতে যাত্রার আসর গম্‌গম্‌ করছে। আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রামবেশী সুদর্শন দিবাকর। মহারাজা খুশী হয়ে তার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন এই মেডেলটা।

দিবাকর দেখতে দেখতে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। তার কাণের কাছে সব কটি মেডেল যেন কাতর আবেদনের সুরে বলতে লাগল—এস, আবার তুমি ফিরে এস আসরে। দিবাকর যেন স্পষ্ট শুনতে পেল জুড়ীর

বাজনা বাজছে। বাজনা ক্রমেই উচ্চ গ্রামে আর দ্রুতলয়ে বাজতে থাকে। দিবাকর যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। এক সময় দু'হাতে কাণ ঢেকে সে চীৎকার করে উঠল একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়। ঠিক সেই সময় মদন এসে ঢুকল ঘরে। দিবাকরকে অমন করতে দেখে সে ভীত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—মাস্টার—!

দিবাকরের সম্বিত ফিরে এল। সে চমকে উঠে বলল—কে ?

মদন হত বিহ্বল নেত্রে চেয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল—আমি মদন। তোমার কি হয়েছে মাস্টার ?

দিবাকর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে— না, কিছু না। কিন্তু তুই হঠাৎ ?…

মদন গভীর দুঃখে ভেঙে পড়ল। কাপড়ের খুট সরিয়ে বার করল 'যুধিষ্ঠির' নাটকের পাণ্ডুলিপি।

দিবাকর সেদিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে তাকাল মদনের দিকে। মদনের চোখ দুটো তখন জলে ভরে উঠেছে। সে ভেজা কণ্ঠে বললো—বিমলা অপেরা উঠে যাচ্ছে মাস্টার। অধিকারী তোমার পালাখানা তাই ফেরৎ দিয়ে দিলে।

বিস্মিত দিবাকর বলল—দল উঠে যাচ্ছে ?

মদন বলল—হ্যাঁ মাস্টার। আজ বিমলা-অপেরার সব মাল পত্তর রঞ্জিত অপেরাকে বেচে দিচ্ছে অধিকারী।

চমকে উঠে দিবাকর বলল—কি—কি বললি !

ভাঙা স্বরে মদন বলল—হ্যাঁ মাস্টার। বিমলা অপেরার নাম মুছে যাচ্ছে যাত্রা জগৎ থেকে।

দিবাকরের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে ক্ষেপে গেল হঠাৎ। তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বলল—না-না, এ হ'তে পারে না। রঞ্জিত অপেরা কিনবে আমার বিমলা অপেরাকে ? মদন, আমি এতদিন মোহগ্রস্থ হয়ে ছিলামরে। আজ আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমার চোখ খুলে গেছে। বিমলা অপেরাকে বেচতে আমি দেব না। মাস্টার মশাইয়ের বড় সাধের বিমলা অপেরা। ওরে, আমি যে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোদের একদিন আলোয় নিয়ে আসব! আমাকে তা করতেই হ'বে। আমাকে প্রমাণ করতেই হবে আমরা যাত্রা করি বলে হেয় নই। আমরা সত্যিকারের

শিল্পী। আমাদের জীবন মূল্যহীন নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোদের শাপমুক্ত করবার জন্যে আজ থেকে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

উল্লসিত মদন বলে উঠল,—মাস্টার—

উত্তেজিত দিবাকর বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ নিজেকে ফুলঝুরির মত জ্বালিয়ে কিছু আলো আমাকে দিতেই হবে এবার। তারপর নিভে যাই দুঃখ নেই!

আয়,—ছুটে আয় আমার সঙ্গে।

দিবাকর উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মদন হতভম্বের মত দৌড়ল তার পিছু পিছু।

বিমলা-অপেরার যাবতীয় মাল-পত্র বাইরের দাওয়ায় এনে রাখা হয়েছে। বড় বড় ট্রাঙ্ক ভর্তি পোশাক, গদা, তরোয়াল, তীর-ধনুক, বর্শা, বাঘছাল নানান রকম মুকুট, পরচুল ইত্যাদি সাজ-সজ্জার সরঞ্জামে ভরে গেছে দাওয়ার সবটুকু জায়গা। দলের সকলে সজল নেত্রে দেখছে তাদের বিমলা-অপেরার মৃত্যু। অধিকারী শ্যামলাল চাদরের খুঁটে চোখ মুচছে। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রঞ্জিত অপেরার মালিক বিশ্ববন্ধুবাবু। তাঁর লোকজনেরা জিনিস-পত্র নেড়ে চেড়ে দেখছে আর তিনি লিস্টে সেগুলোর নাম লিখে নিচ্ছেন। হারাধন কেদে বলল অধিকারীকে—অধিকারী ঐ সেগুন কাঠের গদা জোড়া তোমার বাবা নিজে হাতে বানিয়ে গেছিলেন। আর ঐ সোনালী জরির বডার দেওয়া চাপকানটা…

তাকে বাধা দিয়ে অধিকারী কেদে বলল—আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিসনে হারাণ, আমি এমনিতেই জ্বলে মরছি। ওঃ, এই সময়ে যদি নন্দ একবার আসত…

ঠিক সেই সময় চীৎকার করতে করতে দিবাকর ছুটে এল সেখানে—অধিকারী, অধিকারী—বিমলা অপেরা বেচো না। আমি এসেছি! আর কক্ষণো যাব না দল ছেড়ে!

অধিকারী অশ্রু সজল নয়নে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল দিবাকরকে। তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল সে—নন্দ তুমি এসেছ। একি সত্যি—না স্বপ্ন!

অধিকারীর বুকের মধ্যে মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে দিবাকর বলল—সত্যি অধিকারী সব সত্যি। নন্দ আবার ফিরে এসেছে তার বিমলা অপেরায়। আর সে কোনদিনও তোমাদের ছেড়ে যাবে না!

একটা আনন্দের বন্যা বহে যায়। দলের সবাই যেন ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে দাঁড়ায়। তাদের চোখে মুখে আশার আলো আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে! এ দৃশ্য দেখে অদূরে দণ্ডায়মান বিশ্ববন্ধুর ভ্রূ-জুটো কুঞ্চিত হল। তিনি রেগে গিয়ে তাঁর লোকদের বললেন—চল-চল। এ সব আর বেচবেনা এরা। কত ঢংই জানে যে ছোঁড়া। হুঁ—।

দিবাকর মেতে উঠল তার যুধিষ্ঠির পালা নিয়ে। তার যাত্রা-জীবনের নতুন অধ্যায় স্বরু হয়ে গেল।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হল—

প্রগতিশীল ভ্রাম্যমান অপেরা পার্টি

'বিমল অপেরা'র নবতম অবদান

র'

নতুন আঙ্গিকের নাটক, হৃদয়গ্রাহী অভিনয়, মনোরম সাজ-সজ্জায় ও নয়ন-মুগ্ধকর আলোক-সম্পাতে দর্শকদের মুগ্ধ করবে। যোগাযোগ করুন।

ম্যানেজার 'বিমলা অপেরা'

যুধিষ্ঠির নাটকের অভিনয় শেখাতে শেখাতে তন্ময় হয়ে যায় দিবাকর। বড আশা করে, বহু পরিশ্রমে আর বহু যত্নে সে লিখেছিল এই নাটক। সত্য ন্যায় আর ধর্মের জন্যে যে চরিত্রটি হাজার হাজার বৎসর ধরে অমর হয়ে আছে তাঁরই আত্মকাহিনী—সেই অবিনশ্বর চরিত্র 'যুধিষ্ঠিরের' মহাপ্রস্থানের আলেখ্য নিয়ে সে রচনা করেছিল এই নাটক। দেশকে, জাতিকে, ধর্মে, সততায়, ন্যায় পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

আজ সেই সুযোগ এসেছে। তাই প্রাণ ঢেলে দিয়েছে দিবাকর। তার মন বলছে, এইবার সে সভ্য সমাজের কাছ থেকেই শুধু মহান শিল্পীর স্বীকৃতি পাবে না—রাষ্ট্রের কাছ থেকেও পাবে। আশায় বুক বেঁধে দিবাকর তাই করে চলেছে কঠোর পরিশ্রম। সে ভুলে যায় অতীতের সব অপমান; ভুলে যায় গীতাকে, তার প্রেমকে। সে তার মন ধুয়ে দেবে তার 'যুধিষ্ঠির' নাটক দিয়ে। এই আধমরা প্রাচীন শিল্পকে সে বাঁচিয়ে তুলবেই। এই লোকশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ও মর্যাদাকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

দিন যায়, মাস যায়, বিমলা অপেরার নতুন নাটক 'যুধিষ্ঠিরকে' সে নতুন রঙে, নতুন ঢঙে সাজিয়ে তোলে।

বিমলা অপেরায় ছোট নন্দ দুলাল আবার ফিরে এসেছে। নতুন নাটক তৈরী করছে খবর পেয়ে বায়না করতে ছুটে আসে দেশ-বিদেশের যাত্রাপ্রিয় লোকের দল। অধিকারী বায়না নিতে হাঁপিয়ে ওঠে।

এরপর একদিন খবরের কাগজে আবার বিজ্ঞাপন বেরল 'বিমলা অপেরা'র নবতম অবদান 'যুধিষ্ঠির' এর শুভমুক্তি ঘোষণা করে। দিবাকর বেরিয়ে পড়ে তার দলবল নিয়ে নব বিজয় অভিযানে। দেখতে দেখতে দেশে দেশে অভিনন্দিত হতে থাকে তার 'যুধিষ্ঠির' নাটক। সেই সঙ্গে লোক মুখে সে নিজেও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সারা যাত্রা জগৎ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। আর অবাক হয়ে ভাবে সভ্য সমাজের মার্জিত রুচির মানুষেরা— কে এই প্রতিভাধর, যার স্পর্শে একটা অবহেলিত শিল্প এমন করে সম্মানের দরবারে নিজের আসন করে নিল!

দিকে দিকে ধন্য ধন্য রব ওঠে যাত্রা জগতের ছোট নন্দদুলালের নামে। খবরের কাগজের সংবাদদাতারা, ফটোগ্রাফাররা এসে দিবাকরের খবর টুকে নেন, ফটো তোলেন। সেগুলি কাগজে ছাপাও হয়।

আজ দিবাকর সত্যই তৃপ্ত হয়েছে। মাস্টার মশাইয়ের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে সে আনন্দে কাঁদে আর বলে—আমি পারব মাস্টার মশাই, যাত্রা দলের লোকগুলোকে আলোয় আনতে পারব—নিশ্চয়ই পারব।

আঠার

এই এক বছরে গীতা যেন অনেক রোগা হয়ে গেছে। অন্ধকার ড্রইংরুমে বসে যদুনাথ গড়গড়া টানতে ভুলে যান মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে। তাঁর একমাত্র মেয়েটার আনন্দময় জীবন যে এমন হয়ে উঠবে এটা তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি। ইতিমধ্যে গীতার বিয়ে দেবার জন্যে বড় বড় ঘর থেকে অনেক সম্বন্ধ এসেছিল। প্রত্যেকটি পাত্রই ছিল সবদিক দিয়ে চমৎকার। কেউ ছিল ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়র। কিন্তু গীতা শুনে ম্লান হেসে জবাব দিয়েছে 'বিয়ে সে করবে না।'

বহু অনুরোধ করছেন ভারতী দেবী, অনেক বুঝিয়েছেন যদুনাথ, কিন্তু সেই একই জবাব দিয়েছে গীতা—বিয়ে সে আর কোনদিনই করবে না।

কান্নায় ভেঙে পড়ে ভারতী দেবী যদুনাথকে বলেছেন—কি হবে তাহ'লে? যদুনাথ কোন উত্তর দিতে পারেন নি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করেই থেকেছেন। ইদানীং তিনি লক্ষ্য করেছেন গীতা যেন কি সব ভাবে বসে বসে। ভারতী দেবী একদিন শুনলেন, গীতা ঘরে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি এসে অনুরোধ করলেন যদুনাথকে—হোকগে যাত্রাদলের ছোক্‌রা, ওর সঙ্গেই বিয়ে দাও মেয়ের।

শুনে চমকে উঠেছিলেন যদুনাথ—বলছ কি তুমি! লোকে শুনলে যে…না না, এ আমি হতে দোব না। কিছুতেই না!…

কিন্তু তাঁর সংযমের বাঁধ এবার বোধহয় ভেঙেই যাবে। মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না তিনি। তাকালে ওঁর মনে হয় তিনি যেন নিজে হাতে ওর গলা টিপে হত্যা করছেন। মাঝে মাঝে মনটা তাঁর কেঁদেও ওঠে। নরম হয়ে যান তিনি। কিন্তু আভিজাত্য এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ভয় দেখায় ওঁকে। অসহায় হয়ে পড়েন যদুনাথ।

সেদিন গৃহচিকিৎসক বললেন—এ রোগ এভাবে রাখলে কিছুতেই সারবে না যদুনাথবাবু। মেয়ের মঙ্গল যদি চান তাহলে সেই ছোকরার

সঙ্গেই বিয়ে দিন ওর! এখনও সময় আছে। নইলে বলা যায় না, হয়ত এরপরে ও পাগলও হয়ে যেতে পারে।

চমকে উঠলেন যদুনাথ—বলেন কি ডাক্তার সেন!

ম্লান হেসে ডাক্তার বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। মনের ওপর যত আঘাত লাগবে ব্রেণে তত এ্যাফেক্ট করবে।

মাথাটা ঘুরতে লাগল যদুনাথের। চোখের সামনে সব যে অন্ধকার হয়ে গেল। টলতে টলতে তিনি এসে দাঁড়ালেন গীতার ঘরের সামনে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলেন ঝরে পড়া নির্জীব কুসুমের মত গীতা ঘুমোচ্ছে খাটের ওপর।

বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে ওঠে যদুনাথের। চোখ দুটো জ্বালা করে। সারারাত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন যদুনাথ। কোনটা বড—স্নেহ না আভিজাত্য? এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ছটফট করেন। ভোরের দিকে দৃঢ় হয়ে ওঠেন তিনি। স্নেহের কাছে হার হয় আভিজাত্যের। আলোর কাছে যেমন হেরে পালায় অন্ধকার।

দিনের আলোয় যদুনাথ খুঁজে পান অবলম্বন। তিনি গোপনে দিবাকরের খোঁজ করতে মনস্থ করলেন। গীতাকে বললেন—চল মা, আমরা কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসি। তাতে তোর মনটাও ভাল থাকবে, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে।

গীতা কোন জবাব দিল না।

যদুনাথ পরের দিনই স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বেরিয়ে পডলেন বীরনগরের উদ্দেশ্যে। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনে ছিলেন দিবাকরের দল এখন বীরনগরে 'যুধিষ্ঠির' পালা গেয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বীরনগরে পৌছে যদুনাথ হতাশ হলেন। শুনলেন, গতকাল দিবাকরের দল বীরনগর ছেড়ে আসাম সফরে বেরিয়ে গেছে। শুনে যেমন হতাশ হলেন যদুনাথ তেমনি বিস্মিতও হলেন দিবাকরের প্রশংসা শুনে। শুনলেন দিবাকরের অপরূপ সৃষ্টির কথা। শুনলেন থিয়েটার-সিনেমা নাকি হেরে যাবে তার 'যুধিষ্ঠির' পালার কাছে। আরও শুনলেন, দিবাকর অর্থাৎ ছোট নন্দদুলাল ভারতের একটি পুরাতন ডুবে যাওয়া শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। যাত্রা শিল্পকে বসিয়েছে সম্মানের দরবারে। যদুনাথ ভাবতে লাগলেন, তবে কি তিনি আসামের দিকেই যাবেন?

বাড়ী ফিরে তিনি ভারতী দেবীকে বললেন—দিবাকর আসামে চলে গেছে। চল আজই আমরা আসাম রওনা হয়ে যাই।

ভারতী দেবী বললেন—কিন্তু সেখানে গিয়েও যদি শোন দিবাকর সেখান থেকেও চলে গেছে তাহলে তো শুধু হায়রাণই হতে হবে।

যদুনাথ একটু চিন্তা করে বললেন—কথাটা মিথ্যে বলনি। শুনলাম সে নাকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবে এ বছর। তার চেয়ে চল দিন কতক পুরী বা ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে কোলকাতায় ফিরে যাই। গীতাকে বলি, দিবাকর ফিরলেই তাকে ডেকে নিয়ে আসব।

ভারতী দেবী সায় দিয়ে বললেন—সেই ভাল।

সেদিনই দুপুরবেলা একান্তে চিন্তামগ্না গীতাকে দেখে যদুনাথ তার কাছে এসে বসলেন। স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন—মা···

গীতা ধীরে তাকাল বাবার মুখের দিকে। গীতার করুণ ব্যথা কাতর মুখখানির দিকে চেয়ে ভাঙা স্বরে যদুনাথ বললেন—তুমি ভেবোনা মা। আমি আমাব মনটাকে শক্ত কবে নিয়েছি।

বুঝতে পারলো না গীতা বাবার কথার অর্থ। অবুঝ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাবার দিকে। মিষ্টি হেসে যদুনাথ বললেন—আমি—আমি দিবাকরের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দোব।

চমকে উঠল গীতা। তার শীর্ণ মুখখানিতে বারেকের জন্য যেন বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠল। অস্ফুটে সে শুধু বলল—বাবা।

যদুনাথ বললেন—ভেবে দেখলাম, আমি ভুল করেছি। পেশা তার যাই হোক, মানুষ হিসেবে সে বড মা—অনেক বড়।

গীতার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সে এবার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যদুনাথ তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সস্নেহে বললেন—শান্ত হও মা—শান্ত হও!

উনিশ

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় 'যুধিষ্ঠিরে'র সার্থক অভিনয় করে চলেছে দিবাকর। আজ তার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে আরও বড় হতে হবে—আরও ওপরে ওঠাতে হবে যাত্রা জগৎকে। এখন একমাত্র এই তার লক্ষ্য।

দেশে দেশে ঘোরে সে আর তার 'বিমলা অপেরা'র দল। যেখানেই যায় সম্মান আর যশ কুড়িয়ে বেড়ায়। যে দেখে সেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে—যাত্রায় একি করে সম্ভব হ'ল!

এমনি করে বাঙলাদেশের প্রতিটি জায়গা আসামের সর্বত্রেই দিবাকরের সফর শেষ হয়ে গেল। সে এবার বেরিয়ে পড়ল বিহারের উদ্দেশ্যে। সেখানেও সে পরল জয়মাল্য, পেলো অজস্র অভিনন্দন। প্রকৃত শিল্পীর সম্মান নিয়ে দেশে দেশে ফিরতে লাগল তখন।

এদিকে কোলকাতায় ফিরে যদুনাথ প্রায় বার দশেক দিবাকরের খোঁজ করতে গিয়ে হতাশ হয়েই ফিরে এসেছেন। দিবাকর তার দল নিয়ে যে কবে ফিরবে কেউ তা বলতে পারেনি। শেষ বার খোঁজ করতে গিয়ে তিনি শুনে এসেছেন দিবাকর এখন মহীশূর ছেড়ে মাদ্রাজের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। সেখান থেকে ফেরার পথে তারা দিল্লীতে যাবে। তার দিল্লীর সফরই নাকি এবছরের শেষ সফর হবে।

যদুনাথ ঠিক করলেন দিল্লীতেই যাবেন। কারণ কিছুদিন যাবৎ গীতার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে তিনি বুঝেছেন, দিবাকরকে তার সামনে এবার যেমন করে হোক হাজির করা চাই। আর দেরী করলে চলবে না।

যদুনাথ আবার মালপত্র নিয়ে দিল্লীর পথে পাড়ি জমালেন।

এদিকে মাদ্রাজ সফর শেষ করে দিবাকরও দিল্লীর গাড়ীতে উঠল তার দলবল নিয়ে।

দিল্লার বিখ্যাত ক্লাব 'ইভনিং লজ'-এর আমন্ত্রণ পেয়েছিল দিবাকর। অভিনয় হবে ক্লাবের প্রাঙ্গণে। সরকারী দপ্তরের মহা মহা রথীরা হলেন এই ক্লাবের সদস্য। মন্ত্রীদের মধ্যেও আছেন কয়েকজন।

দিল্লীর এক নামকরা হোটেলে আশ্রয় পেল দিবাকর আর তার দলের লোকেরা। অধিকারী শ্যামলাল এতদিন শুধু হকচকিয়েই এসেছে—আজ এখানে এসে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দিবাকরের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—নন্দ—এ তুমি কোথায় আনলে আমাদের! এ যে ভারতবর্ষের রাজধানী!

মৃদু হেসে দিবাকর বলল—হ্যাঁ! আর আমি তোমাদের আনিনি অধিকারী—এনেছেন এই রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

খুশীতে উপ্‌চে পড়ে অধিকারী বলল—আমরা তাহ'লে সত্যিই জাতে উঠলুম নন্দ!

গর্বের সুরে দিবাকর বলল—হ্যাঁ অধিকারী। শুধু জাতেই উঠিনি—রীতিমত শিল্পীর মর্যাদাও পেয়েছি। এইবার আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকেও সম্মান পেতে চলেছি। আর আমাদের কেউ কোনদিনও যাত্রাদলের ছোকরা বলে ঘৃণা করতে পারবে না। আজ সভ্য সমাজের মানুষ বুঝেছে, আমাদের জীবন—মূল্যহীন নয়।

ঠিক সেই সময়ে দিল্লার কোন এক হোটেলের কামরায় বসে যদুনাথ বোঝাচ্ছিলেন ভারতী দেবীকে। বলছিলেন—যাত্রাদলের ছোকরা বলে যাত্রাওলাদের ঘেন্না করার দিন এবার সত্যিই চলে গেল ভারতী। বিশ্বাস কর, দিবাকর যাত্রা করে বলে আজ আর তার ওপর আমার কোন ঘেন্না নেই। শুনলাম দিবাকরের দলের প্লে দেখে নাকি মাদ্রাজের কোন একজন মন্ত্রী রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেবার জন্যে সুপারিস করেছেন তাদের নাম। বাঙলা দেশ থেকে, তাছাড়া ভারতবর্ষের আরও ক'জায়গা থেকেও দিবাকরের দল যাতে এ বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায় তার জন্যে অনুরোধ করে লিখে পাঠিয়েছে! এই দেখ না, এখানকার কাগজে লিখেছে আজ।

যদুনাথ মেলে ধরেন তাঁর হাতের খবরের কাগজখানা ভারতী দেবীর সামনে। দেখে ভারতী দেবী চমকে ওঠেন—ওমা এযে দিবাকরের ছবি! কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতে দিবাকরের একখানি বড় ছবি সহ বিবরণটি ছাপা

হয়েছে। ভারতী দেবী অসহায়ের মত তাকিয়ে বলেন—কিন্তু এযে ইংরেজি, কি করে পড়ব ?

যতুনাথ বললেন—তোমাকে পড়তে হবে না। আমি এর বাঙলা বলে দিচ্ছি শোন। লিখেছে—অতি প্রাচীন লোক শিল্প হল এই যাত্রা। —এমন একটি প্রাচীন লোকশিল্পকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমলা অপেরার বিখ্যাত শিল্পী ছোট নন্দতুলালকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ ছোট নন্দতুলালের প্রচেষ্টায় এমন একটি অবহেলিত পুরাতন শিল্প সত্যই বেঁচে উঠেছে। আমরা ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই যে, বিমলা অপেরার শিল্পীদের ও তার পরিচালককে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হোক—যাতে করে এই প্রাচীন লোকশিল্পের শিল্পীরা উৎসাহ পায়, উদ্দীপনা পায়—তারা আবার জেগে উঠে তার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। তাহলে বুঝছ তো ভারতী, দিবাকর আজ কত বড় কাণ্ড করেছে ?

ভারতী দেবী বললেন—আমিতো তখনই তোমাকে বলেছিলাম দিবাকর ছেলে হিসেবে খারাপ নয়। সে মিথ্যে বলেছিল প্রাণের দায়ে। তখন তো তুমি শোননি আমার কথা ? মিছামিছি মেয়েটাকে আমার···ভারতী দেবীর কণ্ঠ কান্নায় বুজে এল।

যতুনাথ অপ্রতিভের মত বললেন—আর আমাকে খোঁচা মেরো না ভারতী। আমি সত্যিই অপরাধ করেছি। আমি কথা দিচ্ছি দিবাকরের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নোব।

গীতা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল একা। কি যেন ভাবছিল আপন মনে। তার হাতে দিবাকরের একখানা ফটো। ছবির দিকে চেয়ে ছিল সে উদাস ভাবে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ তুটো জলে ভরে উঠল। ভেজা কণ্ঠে অস্ফুটে বলল—কবে—কবে তোমার দেখা পাব গো। আর কত দেরী আছে ?

হোটেলের বারান্দার নির্জন কোণে একটা আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে শুয়েছিল দিবাকর।

এই ক'মাসের অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে সে দিল্লীতে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে সে এ ক'দিন বিশ্রাম নিয়েছে।

'ইভনিং লজে'র প্লে হতে আরও দিন পাঁচেক বাকী আছে। দিবাকর শুনেছে তার দলের অভিনয় দেখবার জন্যে সারা দিল্লী শহরটাই নাকি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। টিকিট বিক্রী হয়েছে প্রচুর। মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠল দিবাকর।

সন্ধ্যা নেমেছে দিল্লীর পথে-ঘাটে। দিবাকরের মনের মধ্যে তখন আনন্দ-সমুদ্র বইছে। সে তাকিয়েছিল ব্যস্ত যান-বাহনের দিকে। শুনছিল মুখর হোটেলের কলতান। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার অতীত।

অতীত-স্মৃতির রোমন্থন চলে। মনে পড়ে কত কথা, কত ঘটনার কত ছবি। ভাবতে ভাবতে একসময় তার সামনে এসে দাঁড়ায় গীতা,—তার জীবনের প্রথম প্রণয়-কুসুম। বিহ্বল হয়ে পড়ে দিবাকর। মন তার ভেসে চলে গীতার পানে। ভাবে গীতা কি একবারও মনে করেনা তাকে? বড কনট্রাক্টরকে যে মন সে দিয়েছিল, যাত্রাদলের ছোকরাকে সে কি······ মনে পড়ে গীতার সেই কথা,—সারাজীবন আমাকে এমনি ভালবাসবে? বল,—বল না—?

দিবাকরের বুকের মধ্যেটায় মুচড়ে ওঠে। চোখ দুটো জ্বালা করে তার। ভাবতে পারে না কেমন করে গীতা তাকে ভুলতে পারল? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সে নিজেও তো তাকে এতদিন ভুলে ছিল। তাকে ভুলে ডুবে গিয়েছিল তার 'যুধিষ্ঠিরে'র মধ্যে!

যুধিষ্ঠির—!

বুকের মধ্যেকার হৃদ্‌পিণ্ডটা হঠাৎ যেন ধক্ ধক্ করে ওঠে দিবাকরের। 'যুধিষ্ঠির' নাটক তাকে দিয়েছে জীবনের পরম মোক্ষ। সে পেয়েছে সম্মান। পেয়েছে শিল্পীর মর্যাদা। তার মনে হয়, এই 'যুধিষ্ঠিরে'র সাফল্যের জন্যে গীতাই তো পাবে সবটুকু কৃতিত্ব। আজ গীতা তার আর 'যুধিষ্ঠিরে'র মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে সে কি কখনও পারত তার স্বপ্নকে সফল করতে?

মাস্টার—অ-মাস্টার--

দিবাকরের ভাবনার সূত্রটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল অধিকারীর ব্যস্ত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনে। সে চোখতুলে তাকিয়ে দেখল অধিকারী শ্যামলাল ব্যস্তভাবে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কাছে এসে ভয়ার্ত্ত চাপা স্বরে সে বলল,—অ-মাস্টার! এদিকে যে সব্বনাশ হয়েছে। কি হ'বে মাস্টার?

বিস্মিত দিবাকর বিস্ময়ের স্বরে বলল,—কি হয়েছে অধিকারী ?

অধিকারী বলল,—আর কি হ'বে! নবা—ঐ নবা হতচ্ছাড়ার জন্যে মান—এজ্জোত সব যাবে এবার!

চম্‌কে দিবাকর প্রশ্ন করল,—কেন, কি করেছে সে ?

ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে চাপা স্বরে অধিকারী বলল,—হতভাগা গাঁজা টেনেছে!

চকিতে উঠে বসল দিবাকর। চমকে উঠে বলল—কি-কি বললে ?

ভীত কণ্ঠেই অধিকারী বলল,—হ্যাঁ। হতভাগা বাথরুমের মধ্যে ঐ কাণ্ড করেছে!

দিবাকরের ফর্সা মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। সে বিদ্যুৎবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা রাগত স্বরে বলল,—কোথায়—কোথায় সে! তাকে আমি···

উত্তেজনায় তার দুর্ব্বল শরীরটা থর থর করে কাঁপছে দেখে অধিকারী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে ধরে কাঁপা স্বরে বলল,—তুমি রেগো না—মাস্টার! তোমার শরীর ভাল নয়। আমিই দেখছি হতভাগাকে। তুমি বস!

উত্তেজিত দিবাকর বসল না। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে বলল,—না—না, তুমি ডাক তাকে। আমি নিজে হাতে তাকে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে দূর করে দোব দল থেকে!

হাঁপাচ্ছিল দিবাকর। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল,—নবার মত অপদার্থকে আমি আর এক মুহূর্ত্তও আমার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া এ স্বর্গে রাখব না। বড কষ্টে, বহু যত্নে আমি এ স্বর্গ গড়েছি অধিকারী, সেখানে আর আমি কিছুতেই পাপ প্রবেশ করতে দেব না—কিছুতেই না। নবা—নবা—

দিবাকর উত্তেজিত ভাবেই এগিয়ে চলল! হঠাৎ একটা কাসির দমকে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল কাসতে কাসতে।

ছুটে আসে অধিকারী,—মাস্টার—মাস্টার—কি হ'ল ?

দিবাকর তখনও কাসছে। কাসতে কাসতে এক সময় সে এলিয়ে পড়ে অধিকারীর বুকের ওপর।

ভীত অধিকারী কেঁদে ফেলে,—এ্যাঁ! একি হ'ল—ওরে—কে আছিস রে ? বিশু, হারাধন···নিতাই···

অচৈতন্য হয়ে যায় দিবাকর। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অধিকারীর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। ছুটে আসে দলের অনেকে। প্রশ্ন করে,—কি—কি হয়েছে অধিকারী ?

কাঁদতে কাঁদতে অধিকারী বলে,—ওরে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! কিন্তু— শিগ্‌গির যা—ডাক্তার ডেকে আন আগে! শিগ্‌গির—

বিশু ছুটে চলে যায় ডাক্তারের খোঁজে। অধিকারী আর দলের ক'জন মিলে অচৈতন্য দিবাকরকে ধরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল বিছানার ওপর।

একটু বাদেই ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। ভীত কণ্ঠে অধিকারী বলল,—ডাক্তারবাবু,—মাস্টারমশাই···

গলা থেকে ষ্টেথেস্‌স্কোপটা খুলতে খুলতে ডাক্তার বললেন—ভয়ের কোন কারণ নেই আর। আজ রাতটা বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্বস্ত হল অধিকারী। তাকাল অচৈতন্য দিবাকরের দিকে। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠল আবার। কি যেন একটু ভাবল সে। তারপর ধীরপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বারান্দা পেরিয়ে এসে অধিকারী ঢুকল আরেকটা ঘরে। সে ঘরে নবা ভয়ে কাঠ হয়ে বসেছিল। অধিকারী ঘরে ঢুকতেই সে চমকে উঠে দাঁড়াল। অধিকারী চাপা রাগের স্বরে বলল,—নবা—তুই এক্ষুনি বেরো এখান থেকে। তোকে দলে আর রাখবনা আমি। আজ তোর জন্যে আমার যে কি সর্ব্বনাশ হতে বসেছিল···তুই···তুই এই রাত্তিরেই চলে যা! তোকে দেখলে মাস্টার···

নবা এসে আছাড় খেয়ে পডল অধিকারীর পায়ের ওপর। কেঁদে বলল,— এই নাক-কান মলছি অধিকারী—জেবনে আর গাঁজা ছোবনি। এতদিন তো দেখেছ,—গাঁজার ধারে কাছে ঘেঁসেছি? কি করব, এখেনে আসা এস্তোক ভাল ভাল চুরুটের মিষ্টি গন্ধ শুঁকে শুঁকে মনটা কেমন গাঁজা-গাঁজা করে আঁকু পাঁকু করছিল। তাই আর সামলাতে পারিনি। আর কোনদিনও এমনটি হবেনা অধিকারী। এইবারের মত আমাকে মাফ্‌ করে দাও! দল ছাড়তে বেলো না। আমি মরে যাব! স্রেফ মরে যাব!

অধিকারী বলল,—মাস্টার ভাল হয়ে উঠুক। কাল সকালে তার পায়ে ধরবি। সে যদি রাখে তবেই হবে নইলে আমি রাখতে পারবনা। রেগে চলে গেল অধিকারী। আর অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল নবা।

সেদিন 'ইভনিং লজে'র উদ্যানে 'বিমলা অপেরা'র 'যুধিষ্ঠির' অভিনীত হবে।

আনন্দে উচ্ছুসিত যদুনাথ হাতে কয়েকখানা লাল কাগজের টিকিট নিয়ে ভারতীদেবীর সামনে এসে বললেন,—টিকিট আমি পেয়েছি গীতার মা! বহুকষ্টে এই তিনখানা যোগাড় করেছি। এঃ সারা দিল্লী শহরটাই যেন দিবাকরের যাত্রা দেখবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে।

ভারতী দেবী কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন—দিবাকরের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

যদুনাথ থমকে গেলেন একটু। পরে বললেন,—না। তার সঙ্গে দেখা করার বহু চেষ্টাই করেছি এ কদিন, কিন্তু দেখা হয়নি। তার সঙ্গে যখন তখন যে সে দেখা করতে পারে না আজকাল।

বিস্মিত ভারতী চোখ দুটো ডাগর করে বললেন,—বল কি গো?

যদুনাথ বললেন,—হ্যাঁ। সে আজ আর যে সে লোক নয় ভারতী। স্বয়ং মন্ত্রীরাও তার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে আসছেন। প্লে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা হবে না।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভারতী বললেন,—তাহলে কি করে তার নাগাল পাবে তুমি?

যদুনাথ বললেন,—সে ভেবোনা। প্লে-র পরে আমি যেমন করে পারি দেখা করব দিবাকরের সঙ্গে।

ভারতীর সন্দেহ গেল না। তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন,—যদি আজ আর সে তোমার সঙ্গে দেখা না করে,—যদি অপমান করে তোমাকে?

যদুনাথ হেসে বললেন,—আরে না না, দিবাকর তা করতেই পারেনা। সে যে শিল্পী!

ভারতী দেবী বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন যদুনাথের দিকে। যদুনাথ আপন আবেগে বলে চলেন,—জান গীতার মা, দিবাকরের দল যদি এখানে প্লে ভাল জমাতে পারে। প্রতিভার স্বীকৃতি পেতে এখানেই হবে ওর চূড়ান্ত বিচার। তারপর নিজের মনেই বলেন,—ও পারবে—নিশ্চয়ই পারবে! ও যে সত্যিকারের শিল্পী!

কুড়ি

সেদিন সেই যে দিবাকর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আজও পর্যন্ত সুস্থ হতে পারল না। কিন্তু সে দমে গেল না তবুও। অধিকারী শ্যামলালকে ডেকে বলল—পারব, আমি পারব অধিকারী?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় শ্যামলাল বলল—কিন্তু এই শরীরে—তুমি বলতো আজ আমি পালা বন্ধ করে দি। তুমি সুস্থ হলে—

চমকে উঠে দিবাকর বলল—না-না, পালা বন্ধ করা চলবে না। এখানকার যাঁরা দর্শক তাঁরা কলাহাটার দর্শক নন অধিকারী। রাষ্ট্রের সব মহা মহা রথী এঁরা। এঁদের সময়ের দাম দেবে কে? তুমি ভেবো না আমি ঠিক পারব—আর একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনের পরীক্ষায় আজ আর আমি হারতে রাজী নই অধিকারী।

ভীতভাবে অধিকারী বলল—কিন্তু যদি অসুখ বেড়ে যায়?

মৃদু হেসে দিবাকর বলে—তখন তুমি আমার চিকিৎসা করাবে। আমাকে ভাল করে তুলবে।

হঠাৎ যেন তার পরিবর্তন হল। সে ভেঙে পড়ে কাতর ভাবে বলল—আমাকে বাঁচিয়ে রাখ অধিকারী। এখনও আমার অনেক কাজ বাকী আছে। আমি···আমি একা এ সম্মান পেয়ে তৃপ্ত হতে পারব না। এ সম্মান সমগ্র যাত্রা জগৎকে পাওয়াব। সবাইকে আমার পথে টেনে আনব। হ্যাঁ··· এবার আমি আরও নতুন নাটক লিখব। সেই সব নাটক যাত্রা জগতে ছড়িয়ে দোব। তাদের শেখাবো। দেখবে সে সব নাটক হবে এর চেয়েও ভালো, এর চেয়েও উঁচুদরের।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল দিবাকর। সে বলে চলল—এবার যে সব নাটক আমি লিখব অধিকারী সে সব নাটক হবে প্রতিটি মানুষের মনের কথা। তাদের জীবনের কথা। সাধারণ মানুষ, গরীব, দুঃখী, চাষী, মজুর, কামার, ছুতোরের জীবন নিয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্খার কথায়,

ভরানো থাকবে আমার নাটকগুলির পাতা। তাইতো আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমাকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রেখ অধিকারী। আমি যেন ফুরিয়ে না যাই।

শ্যামলাল কেঁদে ফেলল। বলল—কে দিচ্ছে তোমাকে ফুরোতে? আমি বুক দিয়ে আগ্‌লে রাখব না তোমাকে!

দিবাকরের শীর্ণ মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—তাই রেখ অধিকারী—তাই রেখ!

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নবা ঘরে ঢুকে বলল—এই যে অধিকারী, শিগ্‌গির নীচে চল।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অধিকারী শ্যামলালকে বলল—কেনরে, কি হয়েছে?

নবা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—মাস্টারের অসুখ করেছে শুনে দলকে দল সব ছুটে এয়েছে জানতে আজ পালা হবে কি হবেনা। বাস রে কি সব বড বড গাড়ী।

শ্যামলাল অসহায়ের মত তাকাল দিবাকরের দিকে। অভয় দিয়ে দিবাকর বলল—তুমি নির্ভয়ে ওঁদের বলে দাও অধিকাবী প্লে আজ হবে। কোন ভাবনা নেই।

অধিকারী কি একটু ভাবল তারপর নবাকে নিয়ে চিন্তা করতে করতেই চলে গেল ঘর ছেড়ে। সে চলে যাবার পর দিবাকর তার বালিশের তলা থেকে বার করল একখাছি শুকনো ফুলের মালা। সেই মালার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। সে অস্ফুটে বলল—গীতা, আজ যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম আমার যুধিষ্ঠিরের অভিনয় তাহলে যাত্রাদলের ছোক্‌রা বলে আমাকে আর ঘৃণা কবতে পারতে না তুমি!

একটুকাল চুপ করে থেকে দিবাকর আপন মনেই আবার বলল—মিথ্যের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ আমি সত্যের ভিত রচনা করেছি গীতা। আজ যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত তাহলে তোমার কাছ থেকে প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা আমি ঠিক আদায় করে নিতাম।

শুক্‌নো-মালাগাছটিকে দিবাকর তার অশ্রুসজল চোখ দুটির ওপর চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

একুশ

বেলা তখন পাঁচটা।

যদুনাথ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে ভারতীদেবীকে তাড়া দিয়ে বললেন—আরে নাও, নাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। একটু আগে না গেলে শেষে ভীড়ের চাপে যে চেপ্টে যাবে। গীতু মা কৈ? তাকেও তৈরী হতে বল। সময় আর বেশী নেই কিন্তু!

ভারতী দেবীও ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—আমরা এখুনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তুমি গীতাকে ডেকে দাও একটু।

'ইভনিং ক্লাবে'র প্রাচীর ঘেরা প্রকাণ্ড উদ্যানে যাত্রার আসর বসেছে। ঘেরা প্রাচীরের গায়ে 'বিমলা অপেরা'র ভূয়সী প্রশংসা করে বড় বড় পোস্টার আর ব্যানার লাগানো হয়েছে। নানান চেহারার নানান বেশ-ভূষার মেয়ে পুরুষের ভীড়ে গম্ গম্ করছে সমস্ত যাত্রা প্রাঙ্গণ। মার্জিত, শিক্ষিত, ভদ্র, উপর তলাকার মানুষের কোলাহলে সমস্ত আসর মুখরিত হয়ে উঠেছে। একটা বিস্ময়কর কিছু দেখবার জন্যে যেন প্রত্যেকের চোখ সাগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে।

যদুনাথ, গীতা আর ভারতীদেবীও এসেছেন। ওঁদের সকলের চোখেও কৌতূহলের দৃষ্টি। গীতার চোখ দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে দিবাকরকে দেখবার জন্যে। যাত্রা শুরু হবার সঙ্কেত ধ্বনি হল। একটা গুঞ্জন ওঠে আনন্দের। ক্লাবের পক্ষ থেকে একজন সদস্য এসে 'বিমলা অপেরা'র হয়ে দু'চার কথা বলেন। তারপরই শুরু হয়ে যায় যাত্রার প্রথম দৃশ্য। সমস্ত আসর স্তব্ধ হয়ে যায় অভূতপূর্ব আবহসঙ্গীত শুনে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল আলো গুলো কমে যায়—পরিবেশ অনুযায়ী আলোক সম্পাতের জন্যে। আসরে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠির বেশী দিবাকর। গীতার দু'চোখ স্থির হয়ে যায়। যদুনাথ আর ভারতী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন।

ধীরে ধীরে নাটক এগোতে থাকে—আর যতই এগোতে থাকে, দর্শকেরাও ততই অভিভূত হয়ে পড়ে নাটকের অপূর্ব অভিনয় কৌশল দেখে। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন যদুনাথ, ভারতী দেবী আর গীতা।

দিবাকর অভিনয়ের মধ্যে ডুবে গেছে তখন। তার নিপুণ রূপসজ্জা আর অভিনয় দেখে, প্রত্যেক দর্শকেরই মনে হয় এ যেন সত্যই মহাভারতের সেই ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির।

স্তব্ধ আসরের মাঝে যুধিষ্ঠিরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন দিকে দিকে জলোচ্ছ্বাসের মতো আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ এক সময় দিবাকরের দৃষ্টি পড়ল গীতার দিকে। অভিনয় করতে করতে বারেকের জন্য সে যেন কেমন স্থির হয়ে গেলো। চোখ দুটোকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে আবার ঘুরে তাকাল গীতার দিকে। সমস্ত শরীরটার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে গেল দিবাকরের। সে দেখল গীতার পাশে যদুনাথ আর ভারতী দেবীও বসে আছেন। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন তার অভিনয়।

অসুস্থ শরীরের জন্যে দিবাকর প্রাণ দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেও এতক্ষণ পারছিল না। গীতাকে দেখার পর তার যেন মনে হল সে আর অসুস্থ নয় —সম্পূর্ণ সুস্থ। শরীরের লুপ্ত শক্তি ফিরে পেল দিবাকর। অভিনয় তার আরও খুলে গেলো। দর্শকদের ঘন ঘন হাত তালির মাঝে দিবাকর আড চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল গীতাকে—দেখল যদুনাথের সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে গীতাও হাততালি দিচ্ছে।

আনন্দে দিবাকরের চোখ জলে ভরে উঠল। ইচ্ছে হল চীৎকার করে ওঠে—তুমি আজ যাকে দেখে হাততালি দিচ্ছ—সে আর কেউ নয়, সেই যাত্রাদলের ছোকরা—দিবাকর!

একে একে নাটকের সব দৃশ্য অভিনীত হয়ে এল শেষ দৃশ্য। বাকল পরিহিত যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে চলেছেন। তিনি জলদ গম্ভীর নাদে বলেন—

> "একক সংসারে আমি—
> কেহ নাহি মোর—
> নাহি ভ্রাতা, নাই বন্ধু, নাই
> সহধর্মিনী। আছে শুধু সত্য,
> ন্যায় ধর্ম এই মোর"

ক্ষণিকের স্তব্ধতা। তারপর সে কি উচ্ছ্বাস! সে কি অভিনন্দনের সমারোহ! সমুদ্র যেন আনন্দে উল্লসিত হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনধ্বনি যেন কাল বৈশাখীর ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। এরই মাঝে নাটক শেষ হয়ে গেল।

অভিনন্দন জানাতে—ছুটে এলেন দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, হাতে তাঁদের ফুলের মালা। মহামান্য সরকারী কর্মচারীরাও তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। বললেন,—যাত্রা গান যে সত্যিই সার্থক শিল্পরূপে স্বীকৃতি পেতে পারে আজ তা একান্তভাবেই প্রমাণ করেছেন বিমলা অপেরার কর্মীবৃন্দ। তাঁরা শুধু শিল্পীই নন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

শুধু অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না এঁরা। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও যাতে বিমলা অপেরা ও তাঁর কর্মীবৃন্দকে বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তাঁদের কথায় সমর্থন জানিয়ে হাজার হাজার দর্শকও উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠল।

দিবাকরের সর্বদেহ তখন কাঁপছে—থরথর করে কাঁপছে। আনন্দে ঝিমঝিম করছে তার মস্তিষ্কের কোষ আর শিরা উপশিরাগুলো। এত আনন্দ দিবাকরের জীবনে আজ এই প্রথম।

সে আড়চোখে চাইল গীতার দিকে। দেখল, গীতাও চেয়ে আছে তার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে—অপলক দৃষ্টিতে।

সে মুখে আজ আর ঘৃণার ছাপ নেই। তার ঐ গভীর কালো নিষ্পলক নয়নের দৃষ্টি আজ স্বচ্ছ।

সকলের কাছ থেকে কোনও ক্রমে বিদায় নিয়ে দিবাকর সাজঘরের দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে তার মন চাইছিল পিছন ফিরে গীতার দিকে তাকাতে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে যদুনাথের সামনে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরের রূপসজ্জা খুলে দিবাকরের বেশে দাঁড়াতে। ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে বলতে, আমিই সেই—ভণ্ড, লোফার যাত্রাদলের ছোক্‌রা! কিন্তু পারলনা। ধীরে ধীরে সাজঘরের দরজার দিকেই এগিয়ে গেল সে।

যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সবাই একে একে আসর ত্যাগ করে চলে গেছেন। উল্লসিত যদুনাথ ভারতী দেবীকে বললেন,—চল গীতার মা, এইবার দিবাকরের সঙ্গে আমরা দেখা করে আসি!

সঙ্কোচের সঙ্গে ভারতী বলেন,—কিন্তু এখানে···মানে···দিবাকর যদি ··

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে যদুনাথ বললেন,—তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ গীতার মা, দিবাকর খবর পেলেই আমাদের সঙ্গে দেখা না করে পারবেনা। গলার স্বরটাকে একটু নীচু করে তারপর আবার বললেন,—দিবাকর আমাদের দেখেছে! এস —! গী—বলে পাশে তাকিয়েই থমকে গেলেন যদুনাথ। দেখলেন গীতা নেই। তিনি চমকে উঠে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন ভারতীর দিকে। বিস্ময়ে হতবাক ভারতী সন্ধিগ্ধ স্বরে বললেন,—তবে কি গীতা—

সাজঘরের আয়নার সামনে বসে দিবাকর তার মেক্‌আপ তুলতে তুলতে ভাবছিল, গীতার সামনে একবার যাবে নাকি? এখনও গেলে ভীড়ের মধ্যে থেকে তাকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারবে সে। না না, ভালবাসার দাবী নিয়ে যাবেনা। যাবে শিল্পী দিবাকর হয়ে।

পুলকিত হয়ে ওঠে দিবাকর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিদারুণ হতাশায় ভরে ওঠে তার মন। ভাবে, গীতা যদি তার সত্যরূপ দেখে আবার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কিন্তু তাইবা কেমন করে হবে? আজ তো সে আর সেদিনের যাত্রাদলের ছোক্‌রা নেই। আজ তো সে এক সম্মানিত শিল্পী বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে সবার কাছ থেকে। আচ্ছা···গীতা কি এতদিন শোনেনি তার দিগ্বীজয়ের কথা?

নানান্ চিন্তার জট পাকাতে থাকে দিবাকরের মস্তিষ্কের মধ্যে। হঠাৎ তার মনে হয়, যাকে সে দেখেছে সে সত্যিই গীতা না আর কেউ? তার চোখ ভুল দেখেনি তো? হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই, ভুলই দেখেছে সে? নইলে সুদূর দিল্লীতে গীতা আসবে কোত্থেকে! ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভাসে যদুনাথ আর ভারতীদেবীর ছবি। হ্যাঁ, তাওতো বটে! একসঙ্গে তিনজনকে সে কি করে ভুল দেখবে? না না, ও গীতা। নিশ্চয়ই গীতা।

চঞ্চল হয়ে উঠল দিবাকর। গীতার সামনে তাকে গিয়ে আজ দাঁড়াতেই হবে। তাকে জানাতেই হবে, যাত্রাদলের ছোকরা সেই দিবাকরই আজ পাড়াগাঁয়ের বাবুদের বাড়ীর অন্ধকার রক থেকে উঠে এসেছে এই সম্মানের

আসরে। শিল্পীর যোগ্য আসন সে পেয়েছে আজ। আর…হঠাৎ থমকে গেল দিবাকর আয়নার দিকে চেয়ে। বিস্ময়ভরা দুটি ডাগর চোখ মেলে সে দেখল আয়নায় গীতার প্রতিবিম্ব। দু'চোখে অভিমান ফুটিয়ে গীতা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল হতবিহ্বল দিবাকর। গীতা আর এগোলনা। দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুর মত। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল নির্ব্বাক বিস্ময়ে।

দিবাকরের সর্ব্বশরীর তখন দুলছে আর গীতার শুক্‌নো ঠোঁট জোড়া থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ হতবিহ্বল দিবাকরের কণ্ঠ থেকে অস্ফুট বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি শব্দ—'গীতা—'

শিথিল দেহটা একটু যেন কেঁপে উঠল গীতার। অস্ফুটে তার কণ্ঠ দিয়েও বেরিয়ে এল ক'টি শব্দ—'মিথ্যেবাদী যুধিষ্ঠির!' পরক্ষণেই দু'চোখ তার ভরে উঠল জলে। ধরাগলায় সে বলল,—এবার আর তোমাকে পালাতে দোব না আমি—

দিবাকর থম্‌কে গেল। গীতার চোখ দুটোর দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝল ও চোখ যেন তাকে কাছে টানছে। পরমুহূর্ত্তেই আবেগে ভেঙ্গে পড়ে দিবাকর বলে উঠল,—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি গীতা—

ছুটে এল গীতা। ছুটে গেল দিবাকরও। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল বুকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গীতা মুখ লুকালো দিবাকরের বুকে। দিবাকরের দু'চোখও তখন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। সে ভেজা কণ্ঠে বলল, —ভাবিনি, তুমি আবার ফিরে আসবে আমার কাছে। ভাবিনি, স্বপ্ন আমার এমনি করে সফল হবে কোনওদিন!

আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল গীতা,—কেন—কেন তুমি এমনি মিথ্যে বলেছিলে? কেন আমার মন চুরি করে আমাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে?

গীতার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে দিবাকর আবেগের সুরে বলল, —তোমাকে নতুন করে পাব বলে!

গীতার চোখের জল মুছিয়ে দিল দিবাকর। বলল,—আমার এই দুঃসহ তপস্যা আজ সত্যিই সফল হয়েছে গীতা। এতদিনের প্রাণান্ত সংগ্রাম আমার আজ সত্যিই সার্থক হয়েছে!

গীতা বলল,—হ্যাঁ। হয়েছে। তুমি আজ সকল বাধার পাহাড় ঠেলে সরিয়ে দিয়েছ। তাই তো তোমার কণ্ঠে আজ ভাঙ্গা বাঁশিও নতুন আলোর সুরে ভরে উঠেছে।